POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ
يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। (আল আহযাব: ৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 27-28

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 7-14 জুলাই, 2022 7-14 জুল হজ্জা 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সীরাতুন্নবী সংখ্যা

আঁ হযরত (সা.) খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী -কী বিপদ আমার উপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দঃখ বেদনা আমাকে সইতে হবে।
বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলী শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাতে একথা অতি পরিষ্কার, স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত যে, মহানবী (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন,স্বচ্ছ হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির উপর নির্ভর করা ও তদের কাছ আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন তিনি। যিনি খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী -কী বিপদ আমার উপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দঃখ বেদনা আমাকে সইতে হবে।

বরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলী শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম,ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয় প্রদর্শনকারীকে এতটুকু গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য-সত্যই বলছি, নবীকুলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার উপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্যে শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রু থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকালী একজনও দেখা যায় না। সুতরাং কিছুটা হলেও সততার সাথে ভাবা উচিত যে, এসকল পরিস্থিতি কত পরিষ্কারভাবে মহানবীর অভ্যন্তরীণ সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছে। এছাড়া বিবেকবানরা এসব পরিস্থিতি সম্পর্কে যদি আরও চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারবে, যে যুগে মহানবী (সা.) প্রেরিত হয়েছেন তা সত্যিকার অর্থে এমন এক যুগ ছিল, যখন বিরাজমান পরিস্থিতি এক বড় ও মহান ঐশী সংস্কারক ও স্বর্গীয় পথপ্রদর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর যে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাস্তবে তা ছিল সত্য ও অত্যাবশ্যকীয় এবং সেসকল বিষয়ের সমাহার যার মাধ্যমে যুগের সকল চাহিদা পূরণ হতো। আর এ শিক্ষা এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে সত্য ও সততর প্রতি টেনে এনেছে। আর লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে লা ইলাহা ইল্লল্লাহ্‌র' ছাপ প্রোথিত করেছে। অধিকন্তু নবুয়্যতের যা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে অর্থাৎ মুক্তি লাভের নীতি- একে এমন পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়েছে যে, অন্য কোনও নবীর হাতে সেই পরাকাষ্ঠা কোনও যুগে লাভ হয় নি। এ সকল ঘটনা উপর দৃষ্টিপাতে অবলীলায় হৃদয় এ সাক্ষ্য দিবে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই খোদার পক্ষ থেকে সত্য পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যে ব্যক্তি বিদ্বেষ ও হঠকারিতাবশত অস্বীকার করে তার ব্যধি দুরারোগ্য হয়ে থাকে আর এমন মানুষ আল্লাহকেও অস্বীকার করে বসে। নতুবা সত্যের সেসব লক্ষণ যা মহানবীর সত্তায় পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত ছিল অন্য কোন নবীর মাঝে কেউ এর একটি তো প্রমাণ করে দেখাক যেন আমরাও অবগত হতে পারি।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড,পৃ: ১১১)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়	১
দরসুল কুরআন ও হাদীস	২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৫
হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর খুতবা	৯
রাষ্ট্রনেতাদের জন্য মহনবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ	১২
অর্থ-সম্পদ কুরবানী করার গুরুত্ব।	১৬
সাহাবা (রা.) এর জীবনী। [হযরত ইমাম হাসান এবং হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)-এর জীবনী]	

দরূদ শরীফের মধ্যে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর নাম যুক্ত করার তাৎপর্য।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.) বলেন: আমি জানি না এর কারণ কি কিন্তু, একথা সত্যি যে শৈশব থেকেই অতীতের সমস্ত নবীদের মধ্যে আবুল আম্বিয়া (নবীকুলের জনক) হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতি আমার সব থেকে বেশি ভালবাসা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু (যাঁর জন্য আমার প্রাণ নিবেদিত) সৃষ্টির সেরা হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এর ভালবাসা অন্য সকলের ভালবাসাকে ছাপিয়ে গেছে, শুধু তাই নয়, এতটাই প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, অন্য কোনও নবীর প্রতি ভালবাসার সঙ্গে তাঁর প্রতি ভালবাসার কোনও তুলনা হয় না। সেই কারণেই হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর প্রতি বিশেষ ভালবাসা সত্ত্বেও শৈশবে দরূদের এই বাক্যটি كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ আমার মনে খটকা দিত। আর আমি ভাবতাম বাহ্যতঃ এই বাক্যটি দ্বারা হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা, এই দোয়ায় হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উপমা টেনে আনা একথাই প্রকাশ করছে যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) বিশেষভাবে আশিসমণ্ডিত যা এখনও পর্যন্ত আমাদের নবী আঁ হযরত (সা.) প্রাপ্ত হন নি। আর এই কারণেই আমি প্রায়শই দরূদ পড়তে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতাম, একথা ভেবে যে, হে খোদা! একদিকে আমাদের নবী নবীকুলের শ্রেষ্ঠ এবং আদম সন্তানদের সর্দার, তবুও দরূদে এই শব্দ যোগ করা হয়েছে যে, মহম্মদ (সা.)-এর প্রতি সেইভাবেই আশিস বর্ষিত হোক যেভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উপর বর্ষিত হয়েছে।

শেষে আমি ব্যাখ্যা হিসেবে এই পন্থা বের করলাম যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর উপমা দেওয়ার মাধ্যমে আশিসের পর্যায়ক্রমের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁর প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করাই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। আর যেহেতু বংশধারার বিপুল প্রসার লাভের অসাধারণ সম্মান লাভ করেছেন হযরত ইব্রাহিম (আ.), আর তাঁর বংশধারার এটিও একটি বিশেষত্ব যে, তাদের মাঝে বহু নবীর জন্ম হয়েছে। এই কারণে আমি মনে করতাম যে, হয়তো এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম (আ.)এর উদাহরণ দিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য দরূদের দোয়াটি করা হয়। কিন্তু তবুও আমার মন কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারত না, দরূদের এই বাক্যটিতে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পৌঁছেই আমি ভিতর থেকে ঝাঁকুনি অনুভব করতাম আর আমার অন্তরাত্মা যেন হোঁচট খেয়ে পড়ত। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল যে, এটি খোদার শেখানো দোয়া, নিশ্চয় এতে কোনও বিশেষ প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নিহিত রয়েছে। যা সম্ভবত অনেক হৃদয়ের কাছে ধরাও দেয় আর ইনশাআল্লাহ্ আমার নিকটও কোনও দিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। অবশেশে কিছুকাল পূর্বে খোদা আমাকে এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেছেন। এখন খোদা তা'লার কৃপায় সেই ব্যাখ্যায় আমি সন্তুষ্ট যা আমার মাথায় এসেছে। আমি মোটেই একথা বলছি না যে, দরূদে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর নাম যুক্ত করার পিছনে কেবল সেই প্রজ্ঞাটিই দৃষ্টিপটে রয়েছে যা আমার মনে উদিত হয়েছে। খোদা তা'লার বাণীতে, এমনকি রসুলের বাণীতেও অত্যন্ত ব্যাপকতা থাকে আর অনেক সময় একই সঙ্গে একাধিক অর্থ দৃষ্টিপটে থাকে আর হতে পারে যে ব্যাখ্যাটি আমার মাথায় এসেছে, তার থেকে উৎকৃষ্ট অন্য কোনও প্রজ্ঞার বিষয় দরূদে অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু এখন আমি নিজের জায়গায় অন্ততপক্ষে এবিষয়ে অবশ্যই আশ্বস্ত যে, যে অর্থ আমার ধারণা এসেছে তা খোদার কৃপায় সঠিক, শুধু তাই নয়, বরং স্বভাবসুলভভাবে তা সূক্ষ্মধর্মীও বটে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب । আমি এই অর্থটি বন্ধুগণের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করছি।

বন্ধুরা নিশ্চয় জানেন, বস্তুত এটি ইসলামি ইতিহসের এক প্রসিদ্ধ ও অতিপরিচিত ঘটনা যা প্রত্যেক মুসলমান শিশু পর্যন্ত জানে যে, আঁ হযরত (সা.) হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর, যা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আরবের বুকে প্রসার লাভ করেছিল। তারা একথাও জানে যে, হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পবিত্র হাতেই কাবা গড়ে উঠেছিল, যার এক একটি পাথরখণ্ড সেই পবিত্র পিতাপুত্র যুগলের হাজার হাজার দোয়ার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছিল। সেই সময় তাঁরা এই দোয়াও করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে চিরকল আল্লাহ্ তা'লার এমন সব পবিত্র বান্দারা জন্ম নিতে থাকেন যাদের ধ্যানজ্ঞান সব সময় খোদার দ্বীনের প্রতি উৎসর্গিত থাকবে। সেই সময় হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাইল (আ.) সেই বিশেষ দোয়াও করেছিলেন যার পরিণামে আঁ হযরত (সা.) এর আবির্ভাব ঘটেছিল। কুরআন করীম সেই ঐতিহাসিক দোয়াকে এই জোরালো ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন-

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার এই বংশধরদেরকে, যারা এখন এই দেশে প্রসার লাভ করবে এবং তোমার পবিত্র গৃহের চারপাশে বসতি স্থাপন করবে, এদের মাঝ থেকেই একজন মহা মর্যাদাবান রসুল আবির্ভূত কর যে তাদেরকে তোমার আয়াত পাঠ করে শোনাবে, তোমার কিতাব শেখাবেন এবং সেই কিতাবের আদেশাবলীর প্রজ্ঞাও শেখাবেন এবং তাদেরকে নিজের পবিত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এক উন্নত জীবনযাপন পদ্ধতি শেখাবেন। নিশ্চয়, তুমি অতীব মর্যাদাবান এবং মহা প্রজ্ঞাবান।

এই দোয়ার বাক্যের মধ্যে বিরাট কৃপারাজি সংবলিত রয়েছে। কিন্তু এখানে আমি এই দোয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে যেতে চাইছি না, বরং এতটুকু বলতে চাই যে, হযরত ইব্রাহিম এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) কাবা নির্মাণের সময় মক্কাবাসীদের মধ্যে এমন এক বিশেষ নবীর আবির্ভাবের জন্য দোয়া করেছিলেন যিনি নিজের আধ্যাত্মিক, দার্শনিক এবং প্রশিক্ষনিক কর্মসূচির দ্বারা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকবে। আঁ হযরত (সা.) বলেন, 'আমার আবির্ভাব সেই দোয়ার পরিণামেই।তিনি বলেন-

اَنَا دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ অর্থাৎ আমি ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়ার ফল।

অর্থাৎ তিনটি বিষয় আমার সমর্থনে রয়েছে।

প্রথম: আঁ হযরত (সা.) হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর।

দ্বিতীয়: হযরত ইব্রাহিম কাবা নির্মাণের সময় মক্কাবাসীদের মাঝে এক মহান রসুলের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তৃতীয়:আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব সেই দোয়ারই পরিণাম ছিল।

এখন যদি আমরা এই তিনটি বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে দরূদের শব্দগুলি প্রণিধান করি, তবে এবিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। আর একথা প্রমাণ হয় যে দরূদের كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ يَا كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ শব্দ আঁ হযরত (সা.)-এর মর্যাদাকে কোনও অংশে খাটো করছে না, শুধু তাই নয়, বস্তুত এটি এবিষয়েরও প্রমাণ বহন করছে যে আঁ হযরত (সা.)-এর সুউচ্চ মহান মর্যাদা এবং তাঁর উম্মতের অসাধারণ উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে তা দরূদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আসল কথা হল كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ (মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি সেই রূপে আশিস বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের উপর বর্ষণ করেছ) শব্দগুলি এই কারণে রাখা হয়েছে যাতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর সেই বিশেষত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা যায় যা তাঁর কাবা নির্মাণের সময়ের দোয়া এবং তার পরিণামে আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর এর উদ্দেশ্য হল হে খোদা! যেভাবে তুমি ইব্রাহিমের দোয়ার কল্যাণে ইব্রাহিমের বংশে এক মহান রসুলকে আবির্ভূত করেছ, অনুরূপভাবে এবার মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতেও অসাধারণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ধারা অব্যাহত রাখ। এইরূপে দরূদে এক সূক্ষ্ম ও পবিত্র বলয় অর্থাৎ ধর্মীয় বলয় প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হয়েছে। আর খোদার কৃপাকে এই দোয়ার মাধ্যমে তরান্বিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হে খোদা! মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর প্রতি সেইরূপে বিশেষ কৃপা বর্ষণ কর যেভাবে তুমি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর আবির্ভাবের মাধ্যমে ইব্রাহিমের উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছ। অর্থাৎ ঘুরপাকে আঁ হযরত (সা.)-এর আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠার উদাহরণ স্বয়ং আঁ হযরত (সা.)-এর দিকেই ফিরে এসেছে। এবং 'কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহিম' শব্দে হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর জন্য আশিসের দোয়া চাওয়া হয়েছে তাঁর নিজেরই দৃষ্টান্ত দিয়ে। আর হযরত ইব্রাহিম-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে বেল দৃষ্টান্তটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য। লক্ষ্য করুন, কিরূপ বরকতমণ্ডিত বলয় যা দরূদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর দ্বারা দরূদের দোয়ার সারাংশ এই দাঁড়ায় যে, হে খোদা! মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর অসাধারণ আশিস তাঁর নিজের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থেকে না যায়, বরং এই ধারা যেন কিয়ামত পর্যন্ত ক্রমাতগতভাবে বিস্তৃত হতে থাকে আর তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছায়া পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়ে যেন নিরন্তর তাঁর জ্যোতির প্রসার ঘটাতে থাকে।

এখন কেবল একটি প্রশ্ন বাকি থাকে। এই দরূদের দোয়া পূর্ণতা লাভ করেছে কি না? যদি পূর্ণ হয়ে থাকে তবে তা কোন রূপে? এর সোজা উত্তর হল, এই

এরপর শেষের পাতায়.....

আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

(আল আহযাব: ৫৭)

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেন-

"এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রসুল করীম (সা.)-এর কর্মধারা এমন ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর জন্য সীমারেখা নির্ধারণের জন্য কোনও বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নি। শব্দ ব্যবহার করা যেত কিন্তু তিনি স্বয়ং করেন নি। অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মগুলির প্রশংসার উর্দ্ধে, তাকে সীমারেখায় আবদ্ধ করা যায় না। এই ধরণের আয়াত অন্য কোনও নবীর সম্মানে তিনি ব্যবহার করেন নি। তাঁর আত্মায় সেই সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল আর তাঁর পুণ্যকর্মসমূহ খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই আদেশ দিলেন, এখন থেকে লোকে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দরুদ প্রেরণ করবে।'

(মালফুযাত,১ম খণ্ড, পৃ: ২০১৮)

আঁ হযরত (সা.) সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○

অনুবাদ: এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

(আল-আম্বিয়া: ১০৮)

সমগ্র জগতের জন্য নবী।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۭ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۭ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْۗءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۭ نُوْرٌ عَلٰي نُوْرٍ ۭ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ○ (نور : 36)

অনুবাদ: আল্লাহ্ আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর নূর। তাহার নূরের উপমা হইল একটি তাক সদৃশ, যাহার মধ্যে একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনীর মধ্যে আছে, সেই কাঁচের চিমনীটি এমনই দীপ্তিমান, যেন উহা একটি উজ্জ্বল তারকা। উহা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়, যাহা পূর্বেরও নহে পশ্চিমেরও নহে (বরং উহা সারা বিশ্বের জন্য), উহার তৈল এমন যেন এক্ষণই উহা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলিয়া উঠিবে যদিও অগ্নি উহাকে স্পর্শ করে না। নুরের উপর নুর। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন নিজের নুরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানবমণ্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন; বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

(সূরা নুর, আয়াত: ৩৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতে জয়তুনের তেলেরর উল্লেখ রয়েছে। এই তেল দহন হলে আলো উপৎপন্ন হয়। কিন্তু ধুঁয়ো হয় না। لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ এর অর্থ আল্লাহ্র নুর পূর্ব কিম্বা পশ্চিমের জন্য নির্দিষ্ট নয়। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এই উপমার সত্যায়ন স্থল হিসেব পূর্ব ও পশ্চিম উভয়ের জন্য একমাত্র রসুল আর এই নুরই তাঁর মাধ্যমে সাহাবাগণ প্রাপ্ত হয়েছেন। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এই নুরকে কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে নি, বরং এটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। পরবর্তী আয়াতে এই বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সেই নূর সাহাবাদের গৃহেও দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের উদাহরণ এই কারণে দেওয়া হয়েছে, তাদের জ্যোতি দূর দূরান্ত থেকে দেখা যায়। অনুরূপভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং সাহাবাদের জ্যোতিও দূর দূরান্ত থেকে দেখা যাবে। 'মিশকাত' সেই সুরক্ষিত তাককে বলা হয় যেখানে প্রদীপ রাখা হয়। সেই প্রদীপের আলো কাঁচের মধ্য দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে কেবল সেই তাকটিকেই আলোকিত করে না যেখানে সেই প্রদীপটি রাখা আছে, বরং এর বাইরেও সেই আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। প্রদীপের চারপাশে যে কাঁচের গোলাকার চিমনী থাকে তার দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমত এই কাঁচের ঘেরাটোপটি থাকলে ল্যাম্পে ধোঁয়া হয় না, দ্বিতীয়ত, এর আলো বেশি উজ্জ্বল হয়ে বাইরে বিকিরিত হয়।

[তরজমাতুল কুরআন, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে)]

আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র দেহাবয়ব

হযরত হাসান বিন আলি (রা.) বর্ণনা করেন, ' আমি আমার মামা হিন্দ বিন আবি হালাকে আঁ হযরত (সা.)-এর দেহাবায়ব বা চেহারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর দেহাবায়ব বর্ণনা করার বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। ইচ্ছা ছিল তিনি আমাকে এমন কথা বর্ণনা করেন যা আমি ভালভাবে স্মরণ রাখি। হিন্দ বলেন, আঁ হযরত (সা.) প্রতাপান্বিত চেহারার মানুষ ছিলেন। চেহারার মধ্যে এমন উজ্জ্বলতা ছিল যেন পূর্ণিমার চাঁদ। মধ্যম উচ্চতার, অর্থাৎ খুব বেশি দীর্ঘকায় থেকে সামান্য ছোট আর বেঁটেদের থেকে সামান্য লম্বা। মাথার আয়তন বড়, ঈষৎ কোঁকড়ানো এবং ঘন চুল কানের লতি পর্যন্ত নেমে আসত। সিঁথি স্পষ্ট চোখে পড়ত। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। চওড়া ললাট। চোখের ভ্রু দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, কিন্তু লোমশ আর ভ্রুদ্বয় পরস্পর পৃথক ছিল। ভ্রুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানের শুভ্রতা লক্ষণীয় ছিল, যা ক্রোধের সময় স্পষ্টতর হয়ে উঠত। নাক দীর্ঘ খাড়া ও পাতলা, যার উপর জ্যোতির আভা ফুটে উঠত এবং আবছা দৃষ্টিতে কেউ দেখলে তা উঁচু দেখতে পেত। গায়ের লোম ঘন, গণ্ডদেশ কোমল এবং মসৃণ ছিল। মুখ চওড়া, দাঁতগুলি উজ্জ্বল সাদা। চোখের পলক হালকা। কাঁধ সোজা আর করা রৌপ্যের মত সাদা, যার কিছু অংশ উজ্জ্বল লাল ছিল। মাঝারি গড়ন। দেহের গঠন পাতলা কিন্তু সুঠাম। বক্ষদেশ ও পেট সমান। বুক প্রশস্ত। অস্থিসন্ধি গুলি মজবুত ও সুঠাম ছিল। উজ্জ্বল ত্বক কোমল এবং নরম ছিল। বুক ও পেট লোমশহীন, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম লোমের রেখা বুক থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত এবং কাঁধে সামান্য কিছু লোম ছিল। হাতের তালু প্রশস্ত এবং মাংসল ছিল। আঙুলগুলি দীর্ঘ এবং গোলাকার ছিল। পায়ের পাতা মাংসল, কোমল এবং মসৃণ ছিল, এতটাই যে পানিও দাঁড়াতে পারত না। হাঁটার সময় পা পুরোপুরি উঠাতেন। চলার গতি গাম্ভীর্যপূর্ণ, কিন্তু কিছুটা দ্রুত হাঁটতেন যেন উচ্চতা থেকে নেমে আসছেন। কারো দিকে ফিরে তাকালে চেহারার অভিমুখ সম্পূর্ণভাবে তার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন। দৃষ্টি সব সময় নীচের দিকে রাখতেন। মনে হত যেন আকাশের থেকে মাটির দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশি থাকত। তিনি প্রায় অর্ধ উন্মিলিত দৃষ্টিতে দেখতেন। সাহাবাদের পিছনে পিছনে হেঁটে যেতেন এবং তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। প্রত্যেক সাক্ষাতকারীকে প্রথমে সালাম করতেন। (শামায়েল তিরমিযি)

আঁ হযরত (সা.)-এর বাচনভঙ্গি

হযরত হাসান বিন আলি (রা.) বর্ণনা করেন, ' হিন্দ বিন আবি হালাকে আঁ হযরত (*সা.)-এর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা.) দেখে সব সময় এমন মনে হত যেন তিনি অবিরাম কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন রয়েছেন আর কোন চিন্তার কারণে কিছুটা অস্বস্তিতে আছেন। তিনি মিতবাক ছিলেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না,কিন্তু কথা বললে স্পষ্ট করে বলতেন। তাঁর কথা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তা বাগ্মিতাপূর্ণ, প্রজ্ঞাময় এবং পূর্ণাঙ্গীন থাকত, যা অনর্থক কথার সংমিশ্রন থেকে পবিত্র থাকত। কিন্তু তাতে কোন প্রকার ঘাটতি বা সংশয় থাকত না। কথার মধ্যে কারো প্রতি ভর্ৎসনা বা অবজ্ঞা থাকত না, তিনি কারোর অসম্মান করতেন না বা খুঁত বের করতেন না। ছোট ছোট কল্যাণকেও বড় হিসেবে প্রকাশ করতেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুণ প্রকট ছিল। কোন বিষয়ের নিন্দা করতেন না। আর এত বেশি প্রশংসাও করতেন না যেন সেটি তাঁর অত্যন্ত পছন্দ। খাবার সুস্বাদু ও বা স্বাদহীন হলে প্রশংসা বা নিন্দার ক্ষেত্রে যমীন আসমান টেনে আনা তাঁর স্বভাবে ছিল না। সব সময় মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। জাগতিক কোন বিষয় নিয়ে না কখনও ক্ষুন্ন হয়েছেন, আর না কখনো অভিমান করেছেন। কিন্তু যদি সত্যের অবমাননা হত বা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া হত, তবে তাঁর ক্রোধের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সমাধান হয়, তিনি স্বস্তিতে থাকতেন না। নিজের জন্য কখনও রাগ করেন নি, আর না তিনি কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। ইঙ্গিত করলে, পুরো হাত ব্যবহার করতেন, কেবল আঙুল নাড়াতেন না। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলে, হাত উল্টো করে দিতেন। কোন বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দিলে এক হাতকে অপর হাতের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে দিতেন যে, ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর আঘাত করতেন। কোন অপ্রিয় জিনিস দেখলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ভীষণ আনন্দিত হলে চোখদুটি সামান্য বন্ধ করে নিতেন। তাঁর সব থেকে বেশি হাসি চওড়া মৃদু হাসি পর্যন্তই ছিল। অর্থাৎ অট্টহাসি হাসতেন না। হাসির সময় দাঁতগুলি এমনভাবে প্রকাশ পেত যেন মেঘ থেকে খসে পড়া শুভ্র শিলা। (শামায়েল তিরমিযি)

আমাদের নেতা ও অভিভাবক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্কার ও সংশোধন ব্যবস্থাছিল অত্যন্ত ব্যাপক, সার্বজনীন ও সর্বজনস্বীকৃত। এতো উচ্চ পর্যায়ের সংস্কার ও সংশোধনপূর্বের কোন নবীর দ্বারা-ই সম্ভব হয়নি।

আমাদের নবী (সা.) প্রতাপ ও সৌন্দর্য উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন

আমাদের নবী (সা.) প্রতাপ ও সৌন্দর্য উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ ছিলেন। মক্কার জীবন ছিল তাঁর সৌন্দর্যের প্রকাশক এবং মদিনার জীবন ছিল প্রতাপশালী ও গৌরবময়। তাঁর উভয় গুণই উম্মতের মধ্যে এমনভাবে বিতরিত হল যে, সাহাবাগণ (রা.) ছিলেন গৌরবপূর্ণ ও প্রতাপশালী জীবনের প্রতীক অপরদিকে মসীহ মওউদ হলেন আঁ হযরত (সা.)-এর সৌন্দর্যের প্রকাশস্থল।

(রূহানী খাযায়েন, ১৭ তম খণ্ড, আরবাঈন নম্বর- ৪, পৃষ্ঠা: ১৩)

উৎকৃষ্টতম পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী

আমাকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই হল সত্য ধর্ম এবং সমস্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে কেবল কুরআনের হিদায়তই অক্ষত এবং মানবীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত রসূলের মধ্যে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম, পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী। এবং নিজের জীবনযাপন দ্বারা মানবীয় পরাকাষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট নুমনা প্রদর্শনকারী হলেন হযরত সৈয়্যাদানা ও মৌলানা মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)

(আরবাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়

'আল্লাহ্ তা'লা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা করিত হইবে। বস্তুত: আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এই ভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নির্লিপ্ত হইয়া খোদা-প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রঙ দান করিয়া আবেগের শক্তিসহ নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয় লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদা তা'লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৬)

আরবের মরু প্রান্তরে কী ঘটিয়াছিল? ঘটিয়াছিল আশ্চর্য বিপ্লব! ঘটিয়াছিল আশ্চর্যকে ছাড়াইয়া অত্যাশ্চর্য বিপ্লব। একটি জাতি সংখ্যায় কয়েক লক্ষ হইবে- যাহারা নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল- অল্পদিনের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি মহা বলিয়ান হইয়া উঠিল। যাহারা বংশ পরম্পরায় দুর্নীতিপরায়ণ ও কলুষিত হৃদয় ছিল, তাহারা পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়া গেল। অন্ধ দেখিতে লাগিল। যাহারা বোবা ছিল,তাহারা পৃথিবীর বুকে ঐশী সত্যকে প্রচার করিতে লাগিল। এমন এক মহা বিপ্লব সংঘটিত হইল যাহা পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই, এমনকি শোনাও যায় না। ইহা কিভাবে হইল,জানেন কি? কেবল দোয়ার বলে। হ্যাঁ, কেবল দোয়ার বলে। এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারই দোয়ার বলে। দোয়া তো তিনি দিবানিশিই করিতেন। কিন্তু তিনি নিঝুত নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রাণপাত করিয়া যে দোয়া করিতেন, বিশেষভাবে সেই দোয়ার ফলেই ঘটিয়াছিল এই অলৌকিক মহা-বিপ্লব। এমন এক মহা পরিবর্তন আসিল, যাহা এই নিঃসঙ্গ ও নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত বলিয়া ধারণাই করা যায় না। যে কেহ এই পরিবর্তন সাধনকে অসম্ভব মনে করিতে বাধ্য। তথাপি তাহা ঘটিল। হে আল্লাহ্, তাঁহার আত্মাকে আশীর্বাদ কর। তাঁহার প্রতি শান্তি বর্ষণ কর। তাঁহার প্রতি ও তাঁহার উম্মতের প্রতি এত বেশী বেশী পরিমাণ আশিস বর্ষণ কর, যত বেশী বেশী পরিমাণ ছিল তাঁহার উম্মতের জন্য তাঁহার উদ্বেগ-ভালবাসা ও তাঁহার চিন্তা, আর যত বেশী পরিমাণে ছিল উম্মতের ভবিষ্যত সম্বন্ধে তাঁহার ভয়। হে প্রভু, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁহার উপর তোমার বরকত ও অনুগ্রহ রাজি অবিরাম বর্ষণ করিতে থাকো।

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি যে, আগুন বা পানির হইতেও দোয়া অধিকতর দ্রুততা ও শক্তির সহিত কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতি যত উপায়-উপকরণ যোগাইয়াছে, উহার মধ্যে সবচাইতে অধিক শক্তিশালী ও ফলপ্রসু হইল দোয়া। দোয়ার মত কার্যকরী অন্য কিছু নাই।

(বারকাতুদ দোয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৬, পৃ: ৭)

প্রত্যেকটি মিথ্যা ধর্মমত ও প্রত্যেকটি মন্দকর্মকে সমূলে বিনাশ করেছিল। মদ যা সকলকুকর্মের জননী তা বিদূরিত করা হয়েছিল, জুয়া খেলার কৃষ্টিকে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল, কন্যাহত্যার প্রথার মূলোৎপাটন করা হয়েছিল।

আমাদের নেতা ও অভিভাবক আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংস্কার ও সংশোধন ব্যবস্থাছিল অত্যন্ত ব্যাপক, সার্বজনীন ও সর্বজনস্বীকৃত। এতো উচ্চ পর্যায়ের সংস্কার ও সংশোধনপূর্বের কোন নবীর দ্বারা-ই সম্ভব হয়নি। কেউ যদি আরবের ইতিহাস সামনে রেখে চিন্তা করে তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে সেই যুগের মূর্তিপূজারী, খ্রিষ্টান ও ইহুদীরা কেমন গোড়া (ধর্মান্ধ) ছিল! আর যারা শত শত বছর যাবৎ হতাশায় পর্যবসিত ছিল তাদেরকে কেমন (উত্তমভাবে) সংশোধন করা হয়েছিল। আবার চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের শিক্ষা যা সম্পূর্ণরূপেতাদের বিরোধী ছিল, তা তাদের উপর কেমন সুস্পষ্ট কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কিভাবে প্রত্যেকটি মিথ্যা ধর্মমত ও প্রত্যেকটি মন্দকর্মকে সমূলে বিনাশ করেছিল। মদ যা সকল কুকর্মের জননী তা বিদূরিত করা হয়েছিল, জুয়া খেলার কৃষ্টিকে মিটিয়ে ফেলা হয়েছিল, কন্যা হত্যার প্রথার মূলোৎপাটন করা হয়েছিল। আর যা কিছু মানবীয় দয়া, সুবিচার ও পবিত্রতার পরিপন্থী অভ্যাস ছিল তা সবই সংশোধন করা হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, অপরাধীরাও তাদেরঅপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি পেয়েছিল। সুতরাং এ সংস্কার ও সংশোধনের বিষয়টি এমন এক বিষয় ছিল, যা কেউ অস্বীকার করতে পারেনি।

(নুরুল কুরআন,নম্বর-১, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৬, টিকা)

আমাদের নবী (সা.) নিজে কখনো প্রথম তরবারি ধারণ করেন নি। বরং এক সুদীর্ঘ সময় কাফেরদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে ধৈর্যের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর একইভাবে তাঁর (সা.) সাহাবায়ে কেরামও এই উচ্চাঙ্গীন উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁরা (রা.) নির্দেশিত পথেই নিষ্ঠা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন। পদপিষ্ট হয়েও তাঁরা টু শব্দটি করেননি। তাঁদের চোখের সামনে তাদের সন্ড়ানদের টুকরো-টুকরো করা হয়েছে। তাঁদেরকে বয়কট করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত কোন প্রতিবাদ করেনি। কেউ কি পৃথিবীতে এমন উদাহরণ দেখাতে পারবে যে, কোন নবীর কোন একজন অনুসারীও প্রতিবাদের হকদার হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র খোদার আদেশে নিজেকে বিরত রেখেছে? কেউ কি এমন এক গোষ্ঠীর উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবে যারা শান্ড়িতে, একতায় ও প্রতিবাদের সক্ষমতা সত্ত্বেও তের বৎসর পর্যন্ড় ধৈর্য ধারণ করেছে? আমাদের নেতা ও অভিভাবক প্রভু (সা.) ও তাঁর সাহাবিদের এই ধৈর্যধারণ কোন দুর্বলতার পরিচায়ক নয়। কেননা, এই সাহাবিগণই পরবর্তীতে জিহাদের আদেশ পালন করছিলেন। মাত্র এক হাজার লোকের বাহিনী এক লক্ষ আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছিলেন। এটা এজন্য হয়েছিল যেন লোকদের সামনে একথা প্রমাণিত হয় যে, মক্কার রক্ত পিপাসু কাফেরদের সামনে ধৈর্যধারণকারী মুসলমানরা ভীতু ছিলেন না। বরং খোদার আদেশে তারা নিরস্ত্র থেকে গরুছাগলের মত প্রাণ দিচ্ছিল। নিঃসন্দেহে তা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। অন্য কোন নবীর অনুসারীদের ইতিহাসে এমন দেখা যায় না। অতীতের ইতিহাসে এমনটি কদাচ দেখা গেলেও তা ছিল কাপুরুষতা ও প্রতিহত করার শক্তিমত্তার অভাবজনিত কারণে। কিন্তু আমাদের নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ তের বৎসরকাল বীরোচিত সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। অদম্য সাহসী বীরযোদ্ধা হয়েও যাতনা সহ্য করে, রক্তাক্ত হয়ে, চোখের সামনে সন্তানদের টুকরো-টুকরো হতে দেখেও দুষ্টদের প্রতিহত করেননি। এই পরিপূর্ণ পুরুষোচিত আচরণ তের বৎসর পর্যন্ত আমাদের নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ প্রদর্শন করেছিলেন। তের বৎসর পর্যন্ড়প্রতি মুহূর্তে এ ধরনের দুঃখ বরণ করে নেয়া এককথায় অনন্য। কেউ যদি সন্দেহ পোষণ করেন, তবে বলুন তো, বিগত দিনের ইতিহাসে এর জুড়ি কোথায় পাওয়া যায়?

(গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১০-১১)

জুমআর খুতবা

সাহাবীরা এই যুদ্ধে পরম ধৈর্য ও অবিচলতার এমন সাক্ষর রাখেন যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আর অবিরত শত্রুদের দিকে অগ্রসরমান থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

ইয়ামাকের যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা।

মুসাইলামা কাযযাবের হত্যার ঘটনার উল্লেখ।

বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তান, আলজেরিয়া এবং আফগানিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে **প্রদত্ত** ৩রা জুন , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (৩ এহসান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল। এ প্রেক্ষিতে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পর মুনাফিক ও বিরোধীদের সাথে যেসব যুদ্ধ হয়েছিল সেসবের উল্লেখ হচ্ছিল।এরই ধারাবাহিকতায় মুসায়লামা কাযযাবের সাথে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)'র যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের পতাকাবাহকদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আনসারদের পতাকা হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)'র কাছে ছিল আর মুহাজিরদের পতাকা ছিল হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের (রা.)'র কাছে। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, হে লোকসকল! অবিচলতা প্রদর্শন কর, শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড় আর সম্মুখে অগ্রসর হও। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ততক্ষণ কথা বলব না যতক্ষণ আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত না করেন অথবা আমি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত না হবো আর দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর সাথে কথা বলবো। এরপর তিনিও শহীদ হয়ে যান।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নাহাইয়াহ, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ: ৩২০)

হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র সৎভাই ছিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী, অর্থাৎ প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। বদর এবং তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে (তিনি) অংশ নিয়েছেন। মহানবী (সা.) হিজরতের পরে তাঁর এবং মাআন বিন আদী (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থ াপন করেছিলেন। তাদের উভয়েই ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত খালিদ যখন সেনাবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন তখন এক অংশের সেনাপতি হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)-কে নিযুক্ত করেন। একইভাবে এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকাও তার হাতে ছিল। তিনি পতাকা হাতে অগ্রসর হতে থাকেন এবং শহীদ হওয়া পর্যন্ত পরম বীরত্বের সাথে লড়াই করতে থাকেন। শাহাদতের পর (তার হাত থেকে) পতাকা পড়ে যায়। আবু হুযায়ফার মুক্তকৃত ক্রীতদাস সালেম (রা.) পতাকা তুলে নেন। এ যুদ্ধে যায়েদ (রা.) মুসায়লামার ডান হাত এবং একজন বীর অশ্বারোহী, যার নাম রাজ্জাল বিন উনফুয়া ছিল, তাকে হত্যা করেন। আর তাকে যে শহীদ করে তার নাম হল, আবু মরিয়ম হানাফী। সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। একবার হযরত উমর (রা.) যখন তাকে বলেন, তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছিলে তখন সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে যায়েদ (রা.)-কে সম্মানিত করেছেন। আর তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেন নি। অর্থাৎ, তিনি শাহাদতের মৃত্যু লাভ করেছেন আর তখন যদি তার হাতে আমি মারা যেতাম তাহলে লাঞ্ছনার মৃত্যু বরণ করতাম। এখন আমি ইসলামগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছি।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন হযরত উমর (রা.) নিজ শহীদ ভাইয়ের শোকে তাকে বলেন, তোমার চাচা যায়েদ যখন শহীদ হয়ে গেছেন তখন তুমি কেন ফিরে এসেছ? আর কেন নিজের চেহারা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখো নি। যায়েদের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন হযরত উমর (রা.)'র কাছে পৌঁছে তখন তিনি বলেন, যায়েদ দু'টি পুণ্যের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে এগিয়ে গেছেন। এর উল্লেখ পূর্বেও একবার করা হয়েছে যে, তিনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর আমার পূর্বে শহীদ হয়েছেন। মালেক বিন নুওয়ায়রাকে যখন হযরত খালিদ হত্যা করেন তখন তার ভাই মুতাম্মিম বিন নুওয়ায়রা তার ভাইয়ের স্মরণে শোকগাথা লিখে। নিজ ভাইয়ের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। আর প্রায়ই সে তার বিয়োগে ক্রন্দনরত থাকত এবং শোকগাথা পাঠ করত। একবার হযরত উম র(রা.)'র সাথে সাক্ষাতে সে নিজ ভাইয়ের শোকগাথা তাকে শোনায়। তখন হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, আমি যদি শোকগাথা রচনা করতে পারতাম তাহলে তোমার মতো আমিও নিজ ভাই যায়েদের জন্য শোকগাথা পাঠ করতাম। এতে মুতাম্মিম নিবেদন করেন, আমার ভাইয়ের মৃত্যু যদি সেরূপ হতো যেমন মৃত্যু আপনার ভাইয়ের হয়েছে, অর্থাৎ শাহাদতের মৃত্যু; তাহলে আমি কখনো নিজ ভাইয়ের জন্য শোকার্ত হতাম না। উমর (রা.) বলেন, যেরূপ সুন্দরভাবে তুমি আমার ভাইয়ের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেছ সেরূপ আর কেউ করে নি। হযরত উমর (রা.) বলতেন, প্রভাত সমীরণ যখন বয়ে যায় তখন যায়েদের স্মৃতি সতেজ হয়ে যায়।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসিয়্যত অউর কারনামে, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)(তারিখুত তাবারী, ২য় পৃ: ২৮০) (আল ইকতিফা, ২য় ভাগ, পৃ: ১১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরূত)

যাহোক, যুদ্ধের বর্ণনা চলছে। মুসায়লামা কায্যাব তখন পর্যন্ত অবিচল ছিল আর রণক্ষেত্রে(সে) কাফির বাহিনীর প্রাণকেন্দ্র ছিল। হযরত খালিদ বিশ্লেষণ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়লামাকে হত্যা করা না হবে, যুদ্ধ শেষ হবে না। কেননা, কেউ যদি বনু হানীফা থেকে মারা যায় তাদের ওপর অর্থাৎ, মুসায়লামার সঙ্গীদের ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই হযরত খালিদ একা তাদের সামনে আসেন আর একেকজনকে একক যুদ্ধের বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানান এবং নিজেদের স্লোগান উচ্চকিত করেন। মুসলমানদের স্লোগান ছিল 'ইয়া মুহাম্মদা'। অতএব, যে-ই মোকাবিলার জন্য বেরিয়েছে হযরত খালিদ তাকে হত্যা করেছেন। এরপর মুসলমানরা পরম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত খালিদ মুসায়লামাকে দ্বন্দযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান। সে তা গ্রহণ করে। তখন হযরত খালিদ তার জন্য তার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু জিনিস উপস্থাপন করেন। অতঃপর হযরত খালিদ তার ওপর আক্রমণ করেন। তখন সে পলায়ন করে আর তার সঙ্গীরাও পালিয়ে যায়। এতে হযরত খালিদ মানুষকে অর্থাৎ, মুসলমানদের ডেকে বলেন; সাবধান! এখন দুর্বলতা দেখাবে না।

সামনে অগ্রসর হও আর কাউকে বেঁচে ফিরতে দিও না। এতে মুসলমানরা তাদের ওপর চড়াও হয়।

(আল কামিলু ফিততারিখ লি ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড,পৃ: ২২১)

সাহাবীরা এই যুদ্ধে পরম ধৈর্য ও অবিচলতার এমন সাক্ষর রাখেন যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। আর অবিরত শত্রুদের দিকে অগ্রসরমান থাকেন, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া করে। তাদেরকে হত্যা করতে থাকে আর তাদের ঘাড়ে তরবারির আঘাত হানতে থাকে, এমনকি তাদেরকে একটি বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। বনু হানীফার এক সর্দার মুহাক্কেম বিন তোফায়েল পলায়নরত অবস্থায় মানুষকে বলে, হে লোকসকল! এই বাগানে প্রবেশ কর। এটি অনেক বিস্তৃত একটি বাগান ছিল যার চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল ছিল। মুহাক্কেম বিন তোফায়েল বনু হানীফার পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলমানদের মোকাবিলা করতে আরম্ভ করে। এই বাগানটি রণক্ষেত্রের নিকটেই ছিল আর মুসায়লামার মালিকানাধীন ছিল। এই বাগানটিকে হাদীকাতুর রহমান বলা হতো যেভাবে মুসায়লামাকে রহমানুল ইয়ামামা বলা হতো। কিন্তু এই যুদ্ধের সময় উক্ত বাগানে ব্যাপকহারে শত্রুদের প্রাণহানির কারণে এই বাগানকে হাদীকাতুল মওত অর্থাৎ, মৃত্যুর বাগান বলা হতে থাকে। মুসায়লামা কায্যাবও নিজ সঙ্গীদের সাথে এই বাগানে চলে যায়। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর দেখেন যে, বনু হানীফার এক সর্দার মুহাক্কেম বক্তৃতা করছে। তিনি তার প্রতি তির নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করেন। বনু হানীফা বাগানের ফটক বন্ধ করে দেয় আর সাহাবীরা চতুর্দিক থেকে এই বাগানটিকে অবরোধ করে ফেলেন। মুসলমানরা কোন একটি স্থানের সন্ধান করতে থাকেন যেন কোনভাবে বাগানের ভেতরে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু এটি এক দুর্গসদৃশ বাগান ছিল। সন্ধান করা সত্ত্বেও এর ভেতরে যাওয়ার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় নি। অবশেষে হযরত বারা বিন মালেক, যিনি হযরত আনাস বিন মালেকের ভাই ছিলেন, তিনি উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি অনেক সাহসী ছিলেন। তিনি বলেন, হে মুসলমানরা! এখন কেবল একটি পথই খোলা আছে যে, তোমরা আমাকে তুলে বাগানের ভেতরে ফেলে দাও, আমি ভেতরে গিয়ে বাগানের ফটক খুলে দিব। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এটি অসহনীয় ছিল যে, তাদের এক উন্নত মর্যাদার সাথি হাজার শত্রুর মাঝে ঝাঁপ দিয়ে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তারা এরূপ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হযরত বারা বিন মালেক জোর দিতে থাকেন এবং বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্র দোহাই দিচ্ছি; তোমরা আমাকে বাগানের ভেতরে অর্থাৎ, দেওয়ালের অপর দিকে ফেলে দাও। অবশেষে বাধ্য হয়ে মুসলমানরা তাকে বাগানের দেয়ালে তুলে দেয়। প্রাচীরে উঠে হযরত বারা বিন মালিক বিশাল শত্রুবাহিনী দেখে এক মুহূর্ত থেমে পরক্ষণেই আল্লাহ্র নাম নিয়ে বাগানের মূল ফটকের সামনে লাফিয়ে পড়েন আর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে করতে এবং হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে ফটক অভিমুখে ধাবিত হন। অবশেষে তিনি বাগানের দরজায় পৌঁছতে সক্ষম হন এবং দরজা খুলে দেন। বাইরে মুসলমানরা দরজা খোলারই অপেক্ষায় ছিল। দরজা খুলতেই মুসলমানরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করে এবং শত্রুনিধন আরম্ভকরে। বনু হানীফা মুসলমানদের সামনে থেকে পালাতে থাকে কিন্তু তাদের জন্য বাগানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না, পরিণতিতে হাজার হাজার লোক মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, কেবল হযরত বারা বিন মালিক নন বরং আরও কয়েকজন মুসলমান প্রাচীর টপকে দরজার দিকে ধাবিত হয়।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২০০-২০১)(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৩য় খণ্ড, ২য়ভাগ, পৃ: ৩২১) (আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৭ম খণ্ড, ২য়ভাগ, পৃ:২৫৬) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৮) (উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮)

মুসলমানরা মুরতাদদের সাথে লড়তে লড়তে মুসায়লামা কায্যাব পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সে প্রাচীরের এক কোটরে দাঁড়িয়ে ছিল যেন খা কি রঙের কোনো উট দাঁড়িয়ে আছে। আত্মরক্ষার জন্য সে প্রাচীরের ওপর উঠতে চাচ্ছিল এবং ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদকারী ওয়াহ্শী বিন হারব মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হন এবং ঠিক সেই বর্শা, যেটি দিয়ে তিনি হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিলেন, সেটি মুসায়লামাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং সেটি মুসায়লামার শরীরে বিদ্ধ হয়ে এপার-ওপার হয়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে আবু দুজানা সিমাক বিন খারাশা মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন ফলে সে সেখানেই কুপোকাত হয়ে যায়। দুর্গের অভ্যন্তরে এক মহিলা চিৎকার করে বলে, হায়! সুন্দরীদের মনিবকে এক নিগ্রো দাস হত্যা করে ফেলেছে।

(আল বাদাইয়াতু ওয়ান নিহাইয়াহ, ৩য় খণ্ড, ২য়ভাগ, পৃ: ৩২১) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৮)

মুসায়লামা কায্যাবকে কে জাহান্নামে পাঠিয়েছে- এ বিষয়ে বালাযুরি বর্ণনা করেন, বনু আমের গোত্রের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের গোত্রের খিদাশ বিন বশীর নামক এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করেন। অপর বর্ণনায় আনসারের গোত্র খাযরাজের সদস্য আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ তাকে হত্যা করেন(বলে জানা যায়)। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আবু দুজানা তাকে হত্যা করেছেন। মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি নিজেই তাকে হত্যা করেন। কতকের মতে সম্ভবত সবাই তার হত্যায় সম্পৃক্ত ছিলেন। তাবারীসহ কতিপয় পুস্তক থেকে জানা যায়, মুসায়লামাকে এক আনসারী এবং ওয়াহ্শী যৌথ প্রচেষ্টায় হত্যা করেন।

(আসসীদ্দীক, প্রণেতা প্রফেসর, আলি মহসিন সিদ্দীকী, পৃ: ১০২-১০৩০)

ওয়াহ্শী বিন হারব মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করার ঘটনা স্বয়ং বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করার পর মানুষ যখন প্র ত্যাবর্তন করে, তখন আমিও তাদের সাথে প্রত্যাবর্তন করি এবং মক্কাতে অবস্থান করি। মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন এবং মক্কায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে তখন আমি তায়েফ অভিমুখে পালিয়ে যাই। লোকেরা মহানবী (সা.)-এর কাছে দূ ত প্রেরণ করে আর আমাকে বলা হয়, মহানবী (সা.) দূতদের বিরুদ্ধে কোন (শাস্তিমুলক) ব্যবস্থা নেন না। ওয়াহ্শী বলে আমিও তাদের সাথে যাত্রা করি আর একসময়মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যাই। মহানবী (সা.) আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বলি, জ্বী হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, বসো এবং তুমি আমাকে বিস্তারিতভাবে বলো যে, হামযা (রা.)-কে তুমি কীভাবে হত্যা করেছিলে? আমি মহানবী (সা.)-কে সবিস্তারে অবহিত করি। আমার কথা শেষ হলে মহানবী (সা.) বলেন, তোমার জন্য কি সম্ভব যে, আমার সামনে আসবে না? তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে চলে যাই। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন এবং মুসায়লামা কায্যাব বিদ্রোহ করে তখন আমি মনে মনে বলি, আমি অবশ্যই মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হব যেন এর মাধ্যমে হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। তিনি বলেন, এরপর আমি লোকদের সাথে উক্ত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এরপর তার অবস্থা যেমন হওয়ার ছিল হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, (আমি দেখি) এক ব্যক্তি প্রাচীরের কোটরে দাঁড়িয়ে আছে যেন গোধুম রঙের কোনো উট। তার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমি তাকে উদ্দেশ্য করে আমার বর্শা নিক্ষেপ করি তথা আমি তার বুকের মাঝ বরাবর নিক্ষেপ করি ফলে সেটি তার দুই কাঁধের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে যায়। মোটকথা তিনি বর্ণনা করছেন যে, এরপর আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তার মাথায় তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। বর্ণনাকারী সুলেমান বিন ইয়াসার হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)'র কাছ থেকে শুনেছেন যে, যখন মুসায়লামা মারা যায় তখন সেই ঘরের ছাদে থাকা এক মেয়ে বলে ওঠে, 'আমীরুল মুমিনীন' (অর্থাৎ মুসায়লামা)-কে কৃষ্ণাঙ্গদাস হত্যা করেছে। এটি বুখারী শরীফের বর্ণনা।

ওয়াহ্শী বলেন , আমাদের মাঝে (অর্থাৎ, আমি ও সেই আনসারীর মাঝে) কে মুসায়লামা কে হত্যা করেছে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিন্তু যদি আমিই হত্যা করে থাকি তাহলে মহানবীর (সা.)-এর পর সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ, হযরত হামযা (রা.)'র হত্যার জন্যও আমিই দায়ী আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও আমিই হত্যা করেছি।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫২৮)(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭২)

সহীহ্ বুখারীর বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.) ওয়াহ্শীকে যে বলেছিলেন, তোমার জন্য কি আমার সামনে না আসা সম্ভব? এর ব্যাখ্যায় হযরত সৈয়দ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেন, ওয়াহ্শী (রা.)'র মাঝে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল তা তার নিষ্ঠার প্রমাণ বহন করে। তিনি কেনো না কোন ভাবে নিজ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করছিলেন। অতএব, ইয়ামামার ভয়ানক যুদ্ধে নিজের এই ইচ্ছা এবং মনোবাসনা পূর্ণ করে তিনি সফলকাম হয়েছেন। বর্ণনাকারী শাহ সাহেব লিখেন, মহানবী (সা.) এর এই বাক্য- فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّيْ (উচ্চারণ: ওয়া হাল তাসতাতীউ আন তাগাইয়্যেবা ওয়াজহাকা আন্নী) অর্থাৎ, তোমার জন্য কি এটি সম্ভব যে, তুমি আমার সামনে আসবে না?এই শব্দমালা এক অতীব মহান চরিত্রের পরিচায়ক। অর্থাৎ, মহানবী (সা.) ওয়াহ্শীকে নিজ বাসনার কথা বলেছেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার সামনে এসো না। এই বাচনভঙ্গী আদেশসূচক ছিল না বরং এটি ছিল অনুরোধসূচক এবং এর মাধ্যমে হযরত হামযা (রা.)'র প্রতি মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ের সেই গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। এক প্রতিশোধ প্রবণ প্রতিশোধ নিয়ে হৃদয়কে প্র শান্ত করতে পারতো। কিন্তু মহানবী (সা.) এক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণ করেছেন। কেবলমাত্র

এটুকু চেয়েছেন যে, সে যেন তঁ ার সামনে না আসে। যেন হযরত হামযা (রা.)'র মর্মস্পশী শাহাদতের কথা স্মরণে তিনি মর্মযাতনায় না ভোগেন।

(সহী বুখারী, অনুবাদঃ জায়নুল আবেদীন সাাহেব, ৮ম খণ্ড,পৃঃ ১৯৮-১৯৯)

ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা অন্য এক জায়গায়ও বর্ণিত হয়েছে, যেখানে মুসলমানদের সাহসিকতা ও বীরত্বে র বর্ণনা এভাবে এসেছে যে, দুই দলের মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয় যার ফলে দুই দলেরই অসংখ্য মানুষ নিহত ও আহত হয়। মুসলমানদের মাঝে সর্বপ্রথম মালিক বিন অওস শহীদ হন। মুসলমানদের অনেক কুরআনের হাফেয শাহাদত বরণ করেন। দু'দলের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এমনকি মুসলমান দল মুসায়লামার বাহিনীর মাঝে এবং মুসায়লামার বাহিনী মুসলমান দলের মুখোমুখি হয়। যখন মুসলমানরা পিছু হটতো তখন শত্রুপক্ষ সামনে অগ্রসর হত যাতে মুজাআ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। আবু হুযাইফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম নিজ পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত গর্ত খনন করেন। তার কাছে ছিল মুহাজিরদের পতাকা আর সাবেত (রা.)ও নিজের জন্য একই ধরনের গর্ত খনন করেন। তারা দু 'জনেই তাদের পতাকা নিজেদের শরীরের সাথে আঁ াকড়ে ধরেন। মানুষ বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিগ্বি দিক ছুটতে থাকে। অর্থাৎ, গর্ত খনন করে তার মাঝে তারা দাঁড়িয়ে যান এবং এভাবে সালেম এবং সাবেত পতাকা হাতে অবিচল থাকেন। একপর্যায়ে সালেম এবং আবু হুযায়ফা শাহাদত বরণ করেন। হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)'র মস্তক সালেমের পায়ের কাছে পড়ে ছিল এবং সালেম (রা.)'র মস্তক আবু হুযায়ফার পায়ের কাছে পড়ে ছিল। সালেম (রা.) শহীদ হওয়ার পর পতাকা সেখানে কিছুক্ষণ পড়ে থাকে, কেউ সেটি তুলে নি। এরপর বদরী সাহাবী ইয়াযীদ বিন কায়েস (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে উক্ত পতাকা হাতে তুলে নেন। এরপর তিনি (রা.)ও শাহাদত বরণ করেন। এরপর হাকাম বিন সাঈদ বিন আস (রা.) উক্ত পতাকা হাতে তুলে নেন এবং এর সুরক্ষায় পুরো দিন যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। ওয়াহ্শী বলেন, অত্যন্ত ভয়ংকর যুদ্ধ হয়েছিল। তিনবার মুসলমানদের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। চতুর্থবার মুসলমানরা পাল্টা আক্রমণ করে আর এই বারে তাদের নিজের অবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে যায় আর তারাতরবারির তীব্র আক্রমণের মুখেও অটল অবিচল থাকেন। বনু হানীফার ও মুসলমানদের তরবারি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এমনকি আমি তা হতে আগুনের ফুলকি বের হতে দেখেছি। আর আমরা ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় তরবারির শব্দ শুনি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় সাহায্য অবতীর্ণ করেন আর বনু হানীফাকে আল্লাহ্ তা'লা পরাজিত করেন এবং মুসায়লামাকে তিনি হত্যা করেন। তিনি বলেন, আমি সেদিন ব্যাপকভাবে আমার তরবারি চালাই এমনকি আমার হাতে সেই তরবারির হাতল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি হযরত আম্মারকে দেখি তিনি একটি পাহাড়ে উঠে চিৎকার করে বলছিলেন, হে মুসলমানদের দল! তোমরা কি জান্নাত থেকে পলায়ন করছ? আমি আম্মার বিন ইয়াসের, আমার কাছে আসো। বর্ণ নাকারী বলেন, আমি দেখছিলাম; তার কান কেটে ঝুলছিল। আবু খায়সামা নাজ্জারী বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন মুসলমানরা যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আমি একদিকে চলে যাই এবং আমার চোখের সামনে এ দৃশ্য ছিল, অর্থাৎ আমি সেদিন হযরত আবু দুজানাকে দেখছিলাম, তার নাম ছিল সিমাক বিন খারাশাহ্ কিন্তু আবু দুজানা ডাকনামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইনি সেই বিখ্যাত সাহাবী যিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) একটি তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, কে এটির যথোপযুক্ত ব্যবহার করবে? তখন আবু দুজানা বলেন, আমি করব। মহানবী (সা.) তাকে সেই তরবারিটি দান করেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, এর উপযুক্ত ব্যবহার কি? তিনি (সা.) বলেন, মুসলমানদের হত্যা করবে না এবং কাফিরদের ভয়ে পালাবে না। হযরত আবু দুজানা যথারীতি মাথায় লাল পট্টি বাঁধেন এবং দম্ভভরে বীরদর্পে এগিয়ে সারির মাঝে এসে দাঁড়ান। মহানবী (সা.) বলেন, যদিও এভাবে হাঁটা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কোন সমস্যা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পরম বীরত্বের সাথে মোকাবিলা (বা লড়াই) করেন এবং অনেক কাফিরকে হত্যা করেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় অনেক আঘাত বরণ করেন কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছপা হননি।

যাহোক, ইয়ামামার যুদ্ধের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে, এসময় আবু দুজানার ওপর বনু হানীফার একটি দল আক্রমণ করে। এতক্ষণ, পূর্বের বা মহানবী (সা.)-এর যুগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখন, ইয়ামামায় কি হয়েছিল? তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে যে, তাঁর (অর্থাৎ আবু দুজানার) ওপর একটি দল আক্রমণ করে। তখন তিনি তাঁর সম্মুখেও তরবারি চালান, তাঁর ডানেও তরবারি চালান এবং বামেও তরবারি পরিচালনা করেন। তিনি একজনের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে ভূপাতিত করেন। তিনি কোন কথা বলছিলেন না। এমতাবস্থায় সেই দলটি তার থেকে দূরে সরে যায় এবং ফেরত চলে যায় আর মুসলমানরা কাছে চলে আসে। বনু হানীফা পরাজিত হয়ে বাগানের দিকে পলায়ন করে, মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদেরকে বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তারা বাগানের দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন আবু দুজানা বলেন, আমাকে ঢালের ওপর বসিয়ে (বাগানের মধ্যে) ফেলে দাও যাতে আমি ভেতরে গিয়ে বাগানের দরজা খুলে দিতে পারি। অতএব, মুসলমানরা এমনটিই করেন এবং তিনি বাগানের (ভেতরে) পৌঁছে যান। তিনি বলছিলেন, তোমাদের পলায়ন আমাদের হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। তিনি তাদের সাথে তুমুল লড়াই করেন আর এক পর্যায়ে (বাগানের) দরজা খুলে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বাগানে প্রবেশ করে তার কাছে পৌঁছার আগেই তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। আরেকটিরেওয়ায়েত অনুসারে বারা বিন মালেককে বাগানের (ভেতরে) নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু এটির চেয়ে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে নয়।

(আল ইকতিফা, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২১-১২৬) (সহী মুসলি, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬৩৫৩) (কুনযুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯)

এর বিশদ বিবরণও রয়েছে। যাহোক, বাকী ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি পাকিস্তানের জন্য দোয়ার অনুরোধও করতে চাচ্ছি। আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। পাকিস্তানের সামগ্রীক অবস্থাই খারাপের দিকে যাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের আহমদীদের প্রতিও তাদের কুদৃষ্টি পড়ে। বিরোধিতা বাড়ছে। পুরনো কবর উপড়ে ফেলা হতেও তারা বিরত হয়নি। এরা অতি নোংরা প্রকৃতির মানুষ। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে পাকড়াও করুন। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, তারাও বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যায় নিপতিত রয়েছে। আফগানিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবার প্রতি স্বীয় আশিস বর্ষণ করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই, নামাযের পর তাদের (গায়েবানা) জানাযার নামাযও পড়াবো। এদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, জামাতের মুবাল্লিগমোকাররম নাসীম মাহদী সাহেবের, যিনি মোকাররম মওলানা আহমদ খান নাসীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি উনসত্তর বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'*** । আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন মূসী (তথা ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। নিজের পেছনে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং দুই স্ত্রীর পক্ষ থেকে দু'জন করে পুত্র সন্তান ও একজন করে কন্যা রেখে গেছেন। তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে ১৯৭৬ সালে পাশ করেন, এরপর এসলাহ্ ও এরশাদ মোকামী'তে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে তাকে মুবাল্লি গ হিসেবে সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে তাকে নায়েব ওকীলুত তবশীর নিযুক্ত করা হয়। কয়েকমাস তিনি ভারপ্রাপ্ত ওকীলুত তবশীর হিসেবেও কাজ করেছেন। ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি এখানে লণ্ডনে এসেছিলেন, এখানে প্রাইভেট সেক্রেটারী লণ্ডন হিসেবেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এর কয়েকমাস পর ১৯৮৫ সালে তিনি লণ্ডন থেকেই কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি কানাডার মুবাল্লিগ হিসেবে এবং এরপর কানাডার মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে (দায়িত্ব পালনের) সৌভাগ্য লাভ করেন। এসময়ে তিনি কানাডার আমীরও ছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি আমেরিকার মুবাল্লিগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন, এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর পুনরায় সুইজারল্যান্ডে তার পদায়ন হয়। কিন্তু তিনি লিখেন, "ডাক্তার আমার স্বাস্থ্যগত কারণে বলেছেন, এই অবস্থায় আমি ভারী কোন দায়িত্ব পালন করতে পারবো না"। তাই তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি নিয়ে নেন। যাহোক, তাকে আমি লিখেছিলাম, ডাক্তার যদি এমন কথা বলে থাকেন তাহলে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখুন। আরোগ্য লাভ করলে জানাবেন, তাহলে পুনরায় আপনার কাছ থেকে সেবা নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ্, কিন্তু যাহোক তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেমনটি আমি বলেছি, ১৯৮৫ সালে তিনি কানাডা গিয়েছিলেন। ১৯৮৬

সালে 'বায়তুল ইসলাম' মিশন হাউজের জন্য ২৪ একর জমি ক্রয় করা হয়, এরপর সেটিকে আবাদও করা হয়। তার সময় অনেক আহমদী কানাডায় এসে বসতি স্থাপন করেন, তিনি তাদেরকে অনেক সাহায্যও করেন। অধিকাংশ মানুষ অনুগ্রহের কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি চাঁদা ও তাজনীদের সিস্টেম বা ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজ্ড করিয়েছেন। (তার সময়ে) টরোন্টো ও ক্যালগারী'তে দু'টি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য জামা'তে কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে, ভ্যানকুভারের মসজিদটিও সম্ভবত তার সময়েই নির্মিত হয়েছিল। যাহোক, এই দু'টি বিশাল মসজিদ তো আছেই। ২০০৩ সালে তার সময়েই আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামেয়া আহমদীয়া কানাডা প্রতিষ্ঠিত হয়। এমটিএ নর্থ আমেরিকা স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি অনেক কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার এসব সেবা গ্রহণ করুন।

তার স্ত্রী আমাতুন্ নাসীর সাহেবা লিখেছেন, "আমার ২৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে আমার সকল দুঃখ-কষ্টে নাসীম মাহদী সাহেবকে আমার পাশে পেয়েছি, তিনি অনেক ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনকারী একজন স্বামী ছিলেন। একজন স্নেহবৎসল পিতা ও নিঃস্বার্থ ভাই ছিলেন। (তিনি) অত্যন্ত মানবদরদী ছিলেন এবং খিলাফতের একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরম আস্থাশীল (একজন) পুণ্যবান মানুষ ছিলেন।" এরপর তার স্ত্রী তার সম্পর্কে আবারও একথাই লিখেছেন, "তিনি মানুষের নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। মানুষের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। জামাতের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেন না আর তার সামনে (জামাতের বিরুদ্ধে) কারও কথা বলার দুঃসাহসও হতো না, (বা তিনি) করতে দিতেন না। তিনি অনেক বেশি অতিথিপরায়ণ ছিলেন। দরূদ শরীফ পড়ার প্র তি গভীর মনোযোগ ছিল। তার স্ত্রী বলেন, আমি যখন উমরা করতে যাইতখন আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী দোয়া করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি তো সেখানে কেবল দরূদ শরীফ পাঠ করেছি।

তার কন্যা সাদিয়া মাহ্দী বলেন, আমার পিতা অনেক দোয়া করতেন। আমি কখনো দোয়া করতে বললে তিনি বলতেন, দরূদ শরীফ পড়তে থাক। যখনই কোন বিষয়ে দোয়া করতে বলতাম সব সময়ই তিনি দরূদ শরীফ পড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একবার আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি সব বিষয়েই শুধু দরূদ শরীফ পড়তে বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, দরূদ শরীফ পড়। আর বোঝাতেন, দরূদ শরীফই সবচেয়ে বড় দোয়া এটি কবুল হলে সব দোয়া গৃহীত হবে।

ইসমত শরীফ সাহেবা বলেন, মাহদী সাহেব আমার ভগ্নিপতি ছিলেন। তাকে আমি বাইশ বছর খুব কাছে থেকে দেখেছি, তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র , যত্নবান, ভালোবাসাপূর্ণ আচরণকারী এবং যুগ-খলীফার প্রতি ভীষণ নিষ্ঠাবান একজন মানুষ ছিলেন।

তার বোন বলেন, তিনি যখন সুইজারল্যান্ডে জামা'তের মুরব্বী ছিলেন তখন একজন সুইচ মেয়ে বয়আ'ত করেছিল। সে সালানা জলসা উপলক্ষ্যে রাবওয়াতে আসে এবং আমাদের বাড়িতে আসে আর বলে, আমি নাসীম মাহ্দী সাহেবের শ্রদ্ধেয়া মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমার সেই মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা যার পুত্র এমন মেধাবী, যিনি এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো ভাষা রপ্ত করেছেন। কোন ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই তিনি তবলীগের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন আর প্র তিটি বিষয়েই তিনি সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন।

তার পুত্রবধূ বলেন, তিনি আমাদেরকে সব সময়ই দরূদ পাঠের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে করা দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে বলতেন। তিনি বলেন, একবার এয়ারপোর্টে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় পাসপোর্ট দেখি। দেখলাম পাসপোর্টের মেয়াদ পার হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি দরূদ শরীফ পড়া শুরু করেন এবং সেভাবেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন। কাউন্টারের লোকটি পাসপোর্ট দেখেও নি আর এভাবেই তাকে পার করে দেয়।

তার জামাতা লিখেন, আমার বিয়ে হওয়ার পর থেকেই অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতেন। নিজের হাতে চা বানিয়ে দিতেন, ফজরের নামাযের পর আমার সাথে বসে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা ঘটনা শোনানোর পর সেটির তফসীর শোনাতেন আর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আমাদের তরবীয়ত করতেন।

তার কন্যা নাওয়াল মাহদী বলেন, আমি সব সময়ই দেখেছি পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ ছিল আর তিনি পবিত্র কুরআনের সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। এছাড়া আমাদেরকেও বলতেন, গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা কর, এর ফলে তুমি আল্লাহ্ তা'লার কুদরতের লীলা প্রত্যক্ষ করবে আর পবিত্র কুরআন পাঠের স্বাদ পেতে থাকবে। তিনি বলেন, তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, (তার নামাযের) কিয়াম, রুকু ও সিজদা দীর্ঘ হত এবং তার নামায কাকুতিমিনতিতে পূর্ণ থাকত। পবিত্র রমযান মাসে তিনি পবিত্র কুরআনের দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম করে দরস প্রস্তুত করতেন। অন্য লোকেরাও (এ বিষয়টি) লিখেছেন। পবিত্র কুরআনের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য বর্ণনা করতেন আর এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দগুলো উল্লেখ করতেন, ফলে মানুষ খুব সহজে বুঝতে পারত।

কানাডার আমীর লাল খান সাহেব বলেন, কানাডার সাবেক আমীর এবং মিশনারীইনচার্জের সাথে আমি ১৯৮৭ সাল থেকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক গুণে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সেসব গুণ তিনি জামা'তের সেবায় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বন্ধু বানানো, বন্ধুত্ব রক্ষা করা এবং এসব সম্পর্ক ও পরিচিতিকে জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করার সৌভাগ্য দান করেছেন। কানাডিয়ান সমাজের বিভিন্ন বিভাগের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং জামা'তের সাথে তাদেরকে পরিচিত করান। মাশাআল্লাহ্ এই দক্ষতা তার মাঝে খুব ভালোভাবে ছিল। যাদের সাথেই তিনি সম্পর্ক গড়তেন তা খুবই ভালো ও গভীর সম্পর্ক হত আর অন্যরাও এ সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। এভাবে তার মৃত্যুতে অ-আহমদীরাও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। লাল খান সাহেব লিখেন, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশ থেকে আগত সদস্য ও পরিবারগুলোকে দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং সাহায্য করার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্যও আল্লাহ্ তা'লা তাকে দান করেছেন। তিনি আরও বলেন, মজলিসে আমেলার সদস্যদের সাথে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, তার আমীর থাকা অবস্থায় আমি প্রায় বিশ বছর দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছি। এ সময়ে তিনি আমাকে এটি অনুভব করতে দেন নি যে, তিনি আমীর হবার কারণে আমি তার অধীন, বরং তিনি আমার সাথে একজন বন্ধুর ন্যায় আচরণ করেছেন।

ডাঃ আসলাম দাউদ সাহেব বলেন, নাসীম মাহদী সাহেবকে ২০০৯ সালে অর্ডার অব অন্টারিও সম্মাননায় ভূষিত করা হয় যা সেই প্র দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা- যাতে কোন নাগরিক ভূষিত হতে পারে। এই সম্মাননা যেকোন ক্ষেত্রে সফলতা ও সর্বোচ্চ সেবার কারণে প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, আমেরিকায় তার পদায়নের পর একবার জলসা সালানায় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, বর্তমানে তুমি যে অবস্থানে আছো সেই অবস্থানে থেকে যত বেশি মানুষের সেবা করা সম্ভব তা কর। যখনই তোমার কাছে জামা'তের কোন সদস্য আসে তাকে সাহায্য কর এবং কখনো তাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিবে না। তাদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব কর। অনেক সময় মানুষ খোলাখুলি কথা বলে না; এ অবস্থায় গোপনে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের সাহায্য করা উচিত। তি নি বলেন, আমি সবসময় তাকে অভাবীদের সাহায্য করতে দেখেছি এবং সর্বদাই তিনি এমনভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে সাহায্য করতেন যেন অভাবীরা কোনভাবেই লজ্জিত না হয়। মুরব্বী সিলসিলাহ্ শাকুর সাহেব বলেন, তার অনেকগুলো কথার মাঝে একটি উপদেশ আমার মাথায় গেঁথে রয়েছে আর তা হল, জামেয়ার প্রারম্ভি ক বছরগুলোর কথা, সম্ভবত তখন আমি দরজায়ে সানীয়াতে ছিলাম। একদিন আসরের নামাযের সময় আমি হাওয়ায় চপ্পল পরে মসজিদে চলে আসি। তখন তিনি আমাকে বলেন, জামা'তের ওয়াকেফীনদের সবসময় যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়া উচিত যাতে কোন নির্দেশ পেলে সেখান থেকেই তৎক্ষণাৎ তা পালনের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়ে চলে যেতে পার। এমন যেন না হয় যে, তুমি বলবে- 'আমি বাড়ি গিয়ে তৈরি হয়ে আসছি।' মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি দৈহিকভাবেও সবসময় প্রস্তুত থাকা উচিত।

অনুরূপভাবে আমেরিকার মুরব্বী সিলসিলাহ্ ফারাসাত ওমর সাহেব বলেন, আমার যখন জামেয়ার ইন্টারভিউ হয় তখন মাহদী সাহেব একটি প্রশ্ন করেন আর তা হল, তোমাকে যদি মুবাল্লিগ হিসেবে আফ্রিকায় পাঠানো হয় এবং স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে সেখানে বিরোধিতাদেখা

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

দেয় তাহলে তুমি প্র থমে কার সাথে যোগাযোগ করবে? তোমার মায়ের সাথে নাকি খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে? তিনি বলেন, আমি চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিই, খলীফাতুল মসীহ্‌র সাথে। তখন মাহদী সাহেব বলেন, এ উত্তরের ভিত্তিতেই আমি তোমাকে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি আর এটিই সঠিক উত্তর।

মিশন হাউজের সেক্রেটারী কর্ণেল দীদার সাহেব বলেন, নাসিম মাহদী সাহেবের মাঝে খলীফাদের আনুগত্যের স্পৃহা লক্ষ্যণীয়ভাবে পরিলক্ষিত হতো। তার বিভিন্ন অবদানের মধ্যে পিস ভিলেজ প্রতিষ্ঠা হল অন্যতম। যেভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, যেযুগে কানাডার সালানা জলসা বায়তুল ইসলাম মসজিদ সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হতো তখন এর পাশের কৃষি জমির মহিলা মালিক প্রতি বছর জলসার সময় অভিযোগ করতো যে, এদের জলসার শোরগোলের কারণে আমি আতঙ্কিত থাকি এবং তাদের অতিথিশালার খাবারের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। যাহোক,কিছুদিন পর যখন সরকার সেই কৃষি জমির নতুন অঞ্চলায়ন করে তখন এটিকে আবাদি জমি থেকে আবাসিক অঞ্চলে পরিবর্ত ন করে দেয় অর্থাৎ, আবাসিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় তখন নাসীম মাহদী সাহেব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন, এ মর্মে যে; আজ পর্যন্ত একজন মহিলা মালিক আমাদেরকে বিরক্ত করতো এখন তো বহু মালিক এসে পড়বে সেক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্য দেখা দিবে। এ প্রে ক্ষিতে তিনি ঈদের দিন জামাতের সদস্যদের সামনে একটি স্কীম উপস্থাপন করে বলেন, কেন আমরা সবআহমদীরাই এখানে বাড়িঘর বানিয়ে নেই না! আহমদীরাই এ জায়গা কিনে নিই। জামাতের সদস্যরা এ আহ্বানে লাব্বায়েক বলে সাড়া দেন এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় পরবতীতে পীস ভিলেজ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

মুরব্বী সিলসিলাহ্ জিশান গোরাইয়া সাহেব বলেন, তার মাধ্যমে অগণীত যুবক শিক্ষাদীক্ষালাভ করেছে এবং তার এই তরবীয়তের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা মুরব্বী সিলসিলাহ্‌হিসাবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছি। তার তরবীয়তের কল্যাণে আমরা খিলাফতকে ভালোবাসতে শিখেছি এবং আনুগত্যের প্রকৃত প্রেরণা নিজেদের মাঝে বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। অনুরূপভাবে কানাডার সেক্রেটারী উমুরে খারেজা আসেফ খান সাহেব বলেন, আমি তেরো বছর বয়সে ভন-এ এসেছিলাম। তখন মিশন হাউজের আশেপাশে আনুমানিক ডজন খানেক আহমদী ছিল। সেসময় আমার ধর্মীয় জ্ঞান খুবই সামান্য ছিল। সেসময় নাসীম মাহদী সাহেব আমার সাথে নিজের ছেলের মত ব্যবহার করেন, আমার শিক্ষক হয়ে যান। বাস্কেটবল খেলতেন আর আমাদেরকে জামা'তী তথা ধর্মীয় জ্ঞান শিখাতেন। আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে তিনি আমাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করার জন্য জামা'তীভাবে দায়িত্ব দিতেন আর একইভাবে তিনি আজও আল্লাহ্‌র কৃপায় খুবই ভালো কাজ করছেন। তিনি বলেন, আমি সবকিছু তার কাছ থেকেই শিখেছি।

আমেরিকা জামাতের আমীর মির্যা মাগফুর আহমদ সাহেব বলেন, ২০১৬ সনে আমেরিকা জামাতের মিশনারী ইনচার্জ এবং নায়েব আমীর হিসাবে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং অনেক সফরও করেছেন। বিভিন্ন প্রদেশে সফরে গিয়েছেন তবলীগের কাজকে কার্য করীভাবে আরম্ভ করার চেষ্টা করেছেন। মরহুম সেসময় মিডিয়া এবং বিভিন্ন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী আমেরিকার প্রচার ও প্রসারের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া মেক্সিকোতে জামা'ত প্রতিষ্ঠাকল্পে কেন্দ্রীয় নির্দেশনার আলোকেসেখানে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল।

আমেরিকার সেক্রেটারী তবলীগ ওয়াসীম সৈয়দ সাহেব বলেন, সবার সাথে তিনি হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন আর সম্পর্ক স্থাপন তার পক্ষ থেকেই আরম্ভ হতো। আর ইসলামের সেবায় সবাইকে কাজে লাগানোর পন্থা জানতেন। তিনি আমেরিকায় আসার পর প্রতি বছর ১১ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের একটি কার্যকর মাধ্যম বানান এবং মুসলিম ফর লাইফ এবং মুহাম্মদ মেসেঞ্জার অব পীস শিরোনামে মহানবী (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আমেরিকার ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা হয়। এসব বক্তৃতায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মাঝে ব্যাপকহারে লাইফ অফ মুহাম্মদপুস্তকটি উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়। মুসলিম ফর লয়ালটি-এর আয়োজনও তিনি আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় প্রশাসনিক মহলের সাথে সভা-সমাবেশ করেন এবং ইসলামী শিক্ষাকে তাদের সামনে সমুন্নত করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) একবার এক সালানা জলসায় তাঁর বক্তৃতায় সুইজারল্যাণ্ড জামাতের কার্যক্রমের অংশ হিসাবে জামাতের পরিচিতিমূলক ফোল্ডার বিতরণ স্কীমে নাসীম মাহদী সাহেবের কর্মতৎপরতার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের ওপর গবাদি পশু পালনকারী তিনটি গোত্র বসবাস করে। তিনটির ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন। সংখ্যায় আটাশ হাজার। একটির তো সংখ্যা এর চেয়েও কম। যাহোক, তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে আটাশ হাজার সংখ্যায় যারা রয়েছে তাদের ভাষায় ফোল্ডার ছাপিয়ে ফেলে। আর নাসীম মাহদী সাহেব, আল্লাহ্ তা'লা তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমারসাথে পরামর্শ করার পর আট হাজার ফোল্ডার সেখানকার বাড়িঘরে পৌঁছে দেন। সেখানকারপ্রতিটি বাড়িতে তা পৌঁছার পর হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যায়। দু 'টি সংবাদপত্র কঠিন সমালোচামূলক সংবাদ প্রকাশ করে। আমি বললাম, খুব ভালো হয়েছে। তার পক্ষে ভালো দোয়া হয়ে গিয়েছে। সেখানে কয়েক লক্ষ ফোল্ডার বিতরণ হয়েছে।' যাহোক, সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) সেখানে জলসায় উপস্থাপন করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজের প্রিয়দের পদতলে তাকে আশ্রয় প্রদান করুন। তার স্ত্রী-সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন এবং (তাদেরকে) তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সামর্থ্য দান করুন। তিনি যেভাবে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন অতিবাহিত করেছেন তার সন্তানরাও যেন একইভাবে বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটাতে পারে।

পরবতী স্মৃতিচারণ রাবওয়ার স্নেহের মুহাম্মদ আহমদ শারেম-এর। এই কিশোর ষোল বছর বয়সে ঐশী তকদীর অনুসারে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। খিলাফতের প্রতি উৎসগীত, হাস্যবদন এবং সবার প্রিয়ভাজন এক কিশোর ছিল। আর্থিক কুরবানীতে অগ্রগামী ছিল। জামা'তের এবং অঙ্গসংগঠনের অনুষ্ঠানমালাতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়সে মূসী ছিল, এই বয়সেই ওসীয়্যত করেছিল। শোকসন্ত প্ত পরিবারে পিতামাতা ছাড়া দুই বোন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ়মনোবল দান করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হল, মরহুম রশীদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী সেলিমা কুমর সাহেবার যিনি গত ১৬ই মে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন । আল্লাহ্ তা'লার কৃ পায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল তার পিতা চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেবের নানা ম্যাকিরিয়া'র হযরত মৌলভী উযীরউদ্দীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন এবং কাঙড়ায় হেডমাস্টার ছিলেন। তার পিতা চৌধুরী মুহাম্মদ সিদ্দীক সাহেব যিনি মৌলভী ফাযেল পাশ ছিলেন এবং জামা'তের একজন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ছিলেন, একটি দীর্ঘ সময় তিনি খিলাফত লাইব্রেরীর ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি সদর উমুমী রাবওয়া হিসেবেও দীর্ঘদিন সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ, সেলিমা কুমর সাহেবার পিতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র নির্দেশ মোতাবেক রাবওয়া প্রতিষ্ঠাকালে তাঁবু খাটানো এবং প্রথম রাত রাবওয়াতে অবস্থানের সম্মান লাভ করেছিলেন। মরহুমা রাবওয়াতেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে আরবীতে এম.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। (তিনি) দীর্ঘকাল বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৭২-৮২ সাল পর্যন্ত রাবওয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮২-৮৭ সাল পর্যন্ত আমাতুল হাঈ লাইব্রে রীতে লাইব্রেরীয়ান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৭-২০১৮ সাল পর্য ন্ত ৩১ বছর 'মিসবাহ্' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময়কালে তিনি প্রতিকূল পরিস্থি তি সত্ত্বেও 'মিসবাহ' পত্রিকা অনেক ভালোভাবে চালিয়েছেন।

মরহুমা অত্যন্ত পুণ্যবতী স্বভাবের, ইবাদতগুযার, দোয়াগো এবং সরল প্রকৃতির অধিকারিণী ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামাযের পাশাপাশি অন্যান্য নফল নামায যেমন চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামাযও নিয়মিত আদায় করতেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দোয়ার দিকটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। একজন ফিরিশ্‌তা প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও মমতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কখনো কারওপ্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

****

রাষ্ট্রনেতাদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ

মূল: মহম্মদ ইনাম গৌরী, নাযির আলা, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া,কাদিয়ান।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

৯) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

ইহারা এমন লোক যে, যদি আমরা তাহাদিগকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে তাহারা নামায কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ করিবে এবং মন্দ কর্ম হইতে নিষেধ করিবে। বস্তুত সকল পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

১২) اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝

অনুবাদ: নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না। এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।

(সূরা তহা, আয়াত: ১১৯-১২০)

আমি যে তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করেছি ও সেগুলির অনুবাদ উপস্থাপন করেছি, সেগুলিতে কোনও দেশের নাগরিক ও শাসকদের, তা সে যে কোনও শাসনপদ্ধতিই হোক, উভয়ের জন্য স্পষ্ট বার্তা ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

জনসাধারণের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পূর্ণ সততা ভিত্তিক হওয়া উচিত। এমন প্রশাসক নির্বাচিত বা নামাঙ্কিত করার প্রতি আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত যারা সৎ এবং দেশের দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্য। আর যখন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন প্রশাসনিক নেতাদের দায়িত্ব হল ন্যায় পরায়ণতার সঙ্গে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনগণের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা।

জনসাধারণের অধিকারসমূহের মাঝে অগ্রাধিকার পায় প্রাথমিক চাহিদাবলী জোগানের ব্যবস্থা করা। আর ন্যূনতম প্রাথমিক চাহিদা হল পরিস্রুত পানীয় জলের সরবরাহ করার চেষ্ট করা এবং বস্ত্র সরকারের সাধ্যমত বাসস্থানের সংস্থান করা আর এই উদ্দেশ্যেই ইসলাম যাকাত এবং জিযিয়ার ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছে।

এরপর সরকারে কর্তব্য হল জনসাধারণের ধর্ম ও মতবাদ অনুযায়ী তাদেরকে উপাসনা করার স্বাধীনতা দেওয়া এবং মসজিদ, গীর্জা, সিনাগগ এবং মন্দিরের সম্মান এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং এমন এক সমাজ গঠনের চেষ্টা করা যেখানে সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে এবং অপরকেও সদাচার, নৈতিকতা এবং ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ দেওয়ার বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং নিজেকে ও অপরকে যাবতীয় অপছন্দনীয় বিষয় থেকে প্রতিহত করার চেষ্ট করবে, তা সে ধর্মীয় হোক বা জাগতিক, নৈতিক হোক বা সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আসুন দেখি একজন রাষ্ট্রনেতা হিসেবে সৈয়্যদানা হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শ কি ছিল? এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করার জন্য মদিনা প্রশাসনের উপর অগভীর দৃষ্টি দেখতে পাই যে, নবুয়্যতের দাবির পর মক্কায় যারাপরনায় উৎপীড়নের সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার আদেশে ইয়াসরাবের দিকে হিজরত সংঘটিত হয়। মদিনা পৌঁছনোর পর তাঁর সব থেকে বড় চিন্তা ছিল বা-জামাত নামাযের জন্য মসজিদ তৈরী নিয়ে। তিনি 'কুবা' নামক স্থানে প্রথম মসজিদ তৈরী করেন, যেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় পদার্পণ করার পর দুই অনাথের কাছে একটি জমি কিনে মসজিদ নববীর ভিত্তি স্থাপন করেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ কিন্তু প্রশস্ত মসজিদটির ছাদ তৈরী হয় খেজুরের ডালপালা দিয়ে। এইরূপে আল্লাহ্‌র আদেশ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ শিরোধার্য করে তিনি (সা.) বা-জামাত নামাযের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি মদিনার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনের কাজে মনোনিবেশ করেন।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মদিনার শাসনব্যবস্থার পথ মোটেই সুগম ছিল না, আর হযরত মহম্মদ (সা.)ও মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রশাসনিক নেতা হন নি। বরং মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুগামী ছিল, যারা ইসলামের বাণী এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাঁকে ইয়াসরাব আসার আবেদন করছিল। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লারও অভিপ্রায় ছিল এই জনপদটিকে 'মদিনাতুর রসুল' (রসুলের শহর) হিসেবে গড়ে তোলা। তাই আমরা দেখি, আঁ হযরত (সা.) যখন সহায় সম্বল হীন অবস্থায় অতি সংগোপনে তাঁর এক বিশ্বস্ত সঙ্গী হযরত আবুবাকারকে নিয়ে মদিনায় পদার্পণ করলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইয়াসরাবের কতিপয় আনসারদের হৃদয়কে তাঁর প্রতি ভালবাসায় এমন আপ্লুত করে তুললেন এবং তাদের মধ্যে এমন আত্মনিবেদনের স্পৃহা সৃষ্টি করলেন যে, প্রত্যেকেরই আন্তরিক বাসনা ছিল, আঁ হযরত (সা.) যেন তাদের গৃহে অবস্থান করেন। অতঃপর কিছু সময়ের মধ্যেই আঁ হযরত (সা.)-এর পরিবার এবং অন্যান্য সাহাবাগণ হিজরত করে মদিনায় এসে পৌঁছন। যে সমস্ত মুহাজির নিঃস্ব অবস্থায় এসে পৌঁছলেন তাদের পুনর্বসানের বিষয়টি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অথচ আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং একজন প্রবাসী হিসেবে সেখানে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় না ছিল কোনও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, না ছিল কোন রাজকোষ। সেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আঁ হযরত (সা.) যে কৌশল অবলম্বন করলেন, তা হল এই যে, মক্কার প্রতিটি মুহাজিরের সঙ্গে মদিনার প্রত্যেক আনসারের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করে দিলেন। এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন এমন অসাধারণ সম্পর্ক প্রমাণিত হয় যে, অনেক আনসার নিজের মুহাজির ভাইকে বলে দিল, 'আমার এই ধন-সম্পদের অর্ধেক তোমার।' আর নিষ্ঠা ও ভালবাসার উচ্ছ্বাসে তারা এমন প্রস্তাবও দিয়েছিল, 'আমার দুই স্ত্রীর মধ্যে একজনকে তালাক দিয়ে দিচ্ছি, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার তুমি তাকে বিয়ে করে নিও।' কিন্তু সেই মুহাজির ভাই বলেছে, 'তোমার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন তোমারই থাক। আমাকে বাজারের রাস্তা বলে দাও আর কিছু পয়সা ঋন হিসেবে দাও। এরপর তারা অচিরেই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, এমনকি অপরের সহায় হওয়ার যোগ্যও হয়েছে। এই ছিল মদিনার মুসলমান আনসার সাহাবা এবং অপরদিকে মক্কার মুসলমান মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত স্থানীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

এরপর আমরা লক্ষ্য করি যে, এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় আর কোন কোন্ জাতি ও গোত্র বসবাস করত আর তাদের মধ্যে একতা ও সমন্বয়,এবং তাদেরকে একটি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য আঁ হযরত (সা.) কি কি পরিকল্পনা করেছিলেন। মদিনায় সেই সময় ইহুদীদের তিনটি গোত্রের বাস ছিল- বনু কাইয়ানকা, বনু নাজীর এবং বনু কুরাইযা। অপর দুটি পৌত্তলিক গোত্র ছিল বনু অউস এবং বনু খাজরায।

এই পাঁচটি গোত্রের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা বলে কোনও বস্তু ছিল না। বিশেষ করে ইহুদীদের তিনটি গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌমভাবে পৃথক পৃথক দুর্গে বসবাস করত।

অপরদিকে আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর অধিকাংশ সাহাবার মদিনায় হিজরত করে সেখানে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হওয়ার কারণে মক্কার কুরায়েশরা বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তাই তারা শক্তি সঞ্চয়ে মনোযোগী হয়ে পড়ে, যাতে সুযোগ পেলেই মদীনার উপর আক্রমণ করে মুসলমানদেরকে সেখান থেকে উৎখাত করতে সফল হয়।

অতএব, মদিনার অভ্যন্তর ও বাহ্যিক পরিস্থিতি আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাদের জন্য, তারা আনসার হোক বা মুহাজির, মোটেই সুখকর ছিল না। এমনকি আঁ হযরত (সা.) এবং সাহাবাগণও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারতেন না। এই কারণে অন্তত মদিনার মধ্যে মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলিম গোত্রগুলি, বিশেষ করে ইহুদী গোত্রগুলি যাতে শান্তি ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে বসবাস করতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আঁ হযরত (সা.)-এর দুরদৃষ্টি একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করা জরুরী মনে করেন। চুক্তিপত্রের শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল।

১) মুসলমান এবং ইহুদীরার পরস্পর সহানুভূতি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বাস করবে, একে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অত্যাচার করবে না।

২) প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

৩) প্রত্যেক নাগরিকের প্রাণ ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে।

৪) যাবতীয় মতানৈক্য এবং বিবাদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর শরণাপন্ন হতে হবে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

এরপর ১১ পাতায়

আর প্রত্যেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত তার জাতির নিজস্ব শরিয় বিধান অনুযায়ী করা গৃহীত হবে।

৫) যদি ইহুদী বা মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে অপর কোনও জাতি যুদ্ধ করে, তবে ইহুদী ও মুসলমান পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে আসবে।

৬) যদি মদিনার উপর কেউ আক্রমণ করে, সেক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে তারা মোকাবেলা করবে।

৭) মক্কার কুরায়েশ এবং তদের সহযোগীদেরকে ইহুদীদের পক্ষ থেকে কোনও প্রকার সাহায্য বা আশ্রয় দেওয়া হবে না।

৮) কোনও পক্ষই আঁ হযরত (সা.)এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধের জন্য বের হবে না।

৯) এই চুক্তি অনুসারে কোনও অত্যাচারী বা বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী শাস্তি বা প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে রক্ষা পাবে না।

যদি পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে প্রকাশ পায় যে, পূর্বোক্ত ইহুদী গোত্রগুলি ক্রমাগতভাবে চুক্তির কয়েকটি শর্ত লঙ্ঘন করতে থেকেছে আর অউস এবং খাজরাজ গোত্রের কিছু সদস্য মুসলমানদের সঙ্গে থাকাকে নিজেদের জন্য মঙ্গালজনক ভেবে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের অন্তরে ঈমানের ছিটেফোঁটাও ছিল না। বস্তুত, তারা প্রত্যেক সংকটের সময় নিজেদের কপটতা প্রদর্শন করে এসেছে। তথাপি এই চুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমান এবং ইহুদীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে আর মদিনায় এক প্রকার সুব্যবস্থিত রাষ্ট্রের ভিত রচিত হয়েছে যার প্রধান ছিলেন আঁ হযরত (সা.)।

অতএব, এমন প্রতিকুল পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় মদিনার শাসন ব্যবস্থা ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা, অতঃপর নিজের উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সহনশীলতা, সাম্য এবং ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে মদিনাকে এক আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পরিণত করা নিঃসন্দেহে আঁ হযরত (সা.)-এর এক অতুলনীয় কীর্তি ছিল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে নির্বাচিত অথবা নামাঙ্কিত কোনও নিরঙ্কুশ নেতার জন্যও আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।

এখন আমি আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী থেকে বর্ণনা করতে চাই তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদার কথা সরিয়ে রেখে যদি বিবেচনা করি যে, কোন কোন বিশেষত্বের কারণে আঁ হযরত (সা.) কে আমরা একজন সফল ও জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি আর মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী ও কপট ছাড়া মদিনা প্রশাসনের সর্বসাধারণ আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার মাঝে গর্ব অনুভব করত।

সর্বপ্রথম যে বিশেষত্বটি প্রকাশ পায় তা হল ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা- বিশেষ করে এমন একটি প্রদেশে, যেখানে বিভিন্ন ও মতবাদের মানুষের বাস, সেখানে সকলকে নিজের ধর্মমত প্রকাশ এবং শান্তিপূর্ণ প্রচার ও ধর্মাচার অনুশীলনের স্বাধীনতা এবং অপরের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অনুমতি নেই। অতএব, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, মদিনায় একদিকে যেমন ছিল একেশ্বরবাদী তথা আঁ হযরত (সা.)এর উপর ঈমান আনয়নকারী ও কুরআনের শরিয়ত অনুশীলনকারী মুসলমান, অপরদিকে ছিল মূসার শরিয়ত তওরাত অনুশীলনকারী ইহুদী এবং কিছু খৃষ্টধর্মাবলম্বী ও পৌত্তলিক মুশরিক। আঁ হযরত (সা.) তাদের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন সেই চুক্তি মেনে তিনি সকলকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন এবং যে ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে বিবাদের মীমাংসা করতে আসত, তিনি একজন সর্বময় নেতা হিসেবে তাদের নিজেদের শরিয়ত বিধান ও ধর্মমত অনুযায়ী তাদের মীমাংসা করতেন।

কুরআন করীম এও বলেছে যে, তোমরা তাদেরকেও গালি দিও না যাদেরকে তারা আল্লাহ্ ব্যতিরেকে (মাবুদরূপে)ডাকে, অনথ্যায় তারা শত্রুতাবশতঃ অজ্ঞতার কারণে আল্লাহকে গালি দিবে।

(সূরা আনআম, আয়াত: ১০৯)

মক্কার মুশরিকরা ওহদের যুদ্ধে মুসলমান শহীদদের মরদেহগুলিকে বিকৃত করেছিল আর তারা হযরত হামযা (রা.)-এর কলেজা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) কখনও এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা মাথায় আনেন নি।বরং তিনি সব সময় তাদের প্রতি সদাচার করেছেন।

হযরত হাসান বিন আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক যুদ্ধের সময় নিহতদের মাঝে কিছু শিশুদের মৃতদেহও পাওয়া যায়। আঁ হযরত (সা.) জানতে চাইলে এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! তারা তো মুশরিকদেরই সন্তান ছিল।' নবী করীম (সা.) বললেন, 'আজ তোমাদের মাঝে যারা উৎকৃষ্ট তারাও তো কালকে মুশরিকদের সন্তানই ছিল। স্মরণ রেখো! শিশু সব সময়ই সৎ প্রবৃত্তি নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়।পরবর্তীতে তার মা-বাবা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান বানিয়ে দেয়।'

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪)

রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দ্বিতীয় সব উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল আঁ হযরত (সা.) -এর পরম ন্যায়পরায়ণতার পথ যা বিশ্ব শান্তির প্রতিভূ। আজ পৃথিবীতে যে সব অস্থিরতা এবং অশান্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে তার সব থেকে প্রধান কারণ ন্যায় নীতির অভাব। ইসলাম কেবল নিজেদের সঙ্গে নয় বরং অপরের এবং শত্রুদের প্রতিও সুবিচার করার এবং ন্যায়নীতিপূর্ণ আচরণ করার শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে হযরত রসুল করীম (সা.)=এর জীবনী অসাধারণ সব দৃষ্টান্তে সুসজ্জিত রয়েছে। সময়ের অপ্রতুলতার কারণে দুটি ঘটনা উপস্থাপন করব।

যে সব জাতির নৈতিক অধঃপতন হতে শুরু করে, তাদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যায় প্রচলন পেতে শুরু করে। আর এই প্রথা সর্বজনীন হয়ে ওঠে যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আইনের বিরুদ্ধাচারণ করেও বেঁচে যায় আর কেবল গরিব ও অসহায় মানুষরাই শাস্তি পায়। কিন্তু হযরত মহম্মদ (সা.) জগতসমূহের আশীর্বাদ এবং 'রঊফুর রহীম' হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তের বিধান বলবৎ করার বিষয়ে যারপরনায় আত্মাভিমানী ছিলেন আর কখনও তিনি ন্যায় নীতিকে বিসর্জন দিতেন না। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) =এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে-

'বনু মাখযুম গোত্রের ফাতিমা নামের এক মহিলা চুরি করে। লোকেরা চাইল রসুল করীম (সা.)-এর নিকট এই মহিলার প্রতি দয়া প্রদর্শনের সুপারিশ করা হোক। তাই উসামা বিন যায়েদকে এর জন্য প্রস্তুত করা হয়, যিনি রসুল করীম (সা.)-এর ভীষণ প্রিয়পাত্র ছিলেন,তিনি রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে দয়া প্রদর্শনের আবেদন করেন। হযরত রসুল করীম (সা.) এই কারণ ভীষণ রুষ্ট হন, উত্তেজনায় তাঁর গালদুটি লাল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন-

'বনী ইসরাঈলদের রীতি ছিল যে যখনই তাদের কোনও ধনী ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, কিন্তু যখন কোনও গরিব ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার হাত কেটে দিত। কিন্তু সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি মহম্মরে কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, তবে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম।"

اللّٰهم صلّ علىٰ محمّدٍ وّآل محمّدٍ وبارك وسلّم ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এইরূপ। বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের বন্দীদের মাঝে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা আব্বাসও (রা.) ছিলেন। হযরত উমর (রা.)যখন সেই বন্দীদের দেখাশোনার দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি মসজিদ নববীর বেষ্টনীর মধ্যে থাকা হযরত আব্বাস (রা.) সমেত সমস্ত বন্দীদের বাঁধন শক্ত করে বেঁধে দিলেন। রসুল করীম (সা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন যখন তিনি তাঁর চাচার আর্তনাদ শুনলেন। তাঁর চোখের ঘুম উধাও হয়ে গেল। আনসার সাহাবাগণ কোনওরূপে যখন এর কারণ জানতে পারল, তখন তারা হযরত আব্বাসের বাঁধন শিথিল করে ফেললেন যার কারণে তাঁর চিৎকারের শব্দ থেমে গেল। আঁ হযরত (সা.) জানতে চাইলেন যে, আব্বাসের চিৎকারের শব্দ কেন শুনতে পাচ্ছি না? সাহাবারা নিবেদন করলেন, 'হে রসুলুল্লাহ্! আমরা আপনার মর্মবেদনার কথা চিন্তা করে তাঁর বাঁধন আলগা করে দিয়েছি। আঁ হযরত (সা.) বললেন, এটা তো অন্যায়! হয় অন্যদের বাঁধনও আলতো করে বাঁধ অন্যথায় আব্বাসের বাঁধনও শক্ত করে দাও।

আরও একটি বিশেষত্ব হল, আঁ হযরত (সা.) নিজের আদর্শ দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের বুঝিয়েছেন যে, একজন সফল নেতা ও সেনাপতি হওয়ার জন্য প্রত্যেক সংকটের মুহূর্তে জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকা আর যতটা সম্ভব যথাসময়ে পৌঁছে পথপ্রদর্শন করা এবং জাতিকে উৎসাহ জোগানো। এ প্রসঙ্গে কেবল একটি উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

খন্দকের যুদ্ধে প্রতিরক্ষা তথা যুদ্ধের রণকৌশল হিসেবে মদিনার চতুপার্শ্বে পরিখা খনন করা হচ্ছিল। সেই সময় সাহাবারা ক্ষুধজনিত কষ্ট লাঘবের জন্য পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। খননকার্যের সময় একটি পাথর ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। সাহাবারা আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যান। অপরদিকে আঁ হযরত (সা.)নিজেও ক্ষুধাজনিত কষ্ট কম করতে নিজের দুটি পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। সেই অবস্থাতেও তিনি হাতে কোদাল নিয়ে সেই পাথরের চাঁইয়ের উপর তিন বার আঘাত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

করে সেটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেন। খোদার কি মহিমা! সেই শক্তিহীন ও অসহায় অবস্থাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকটি আঘাতের সময় তাঁকে আশপাশের বিশাল সাম্রাজ্যগুলির উপর মুসলমানদের বিজয়ের দৃশ্য দেখাচ্ছিলেন। আর প্রত্যেক আঘাতের সময় আল্লাহু আকবার নারাধ্বনি উচ্চকিত করে সাহাবাদের সুসংবাদ প্রদান করছেন যে, সিরিয়া ও ইরান এবং ইয়েমেনের রাজ প্রসাদের চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছে।

আঁ হযরত (সা.) -এর জীবদ্দশাতেই ইসলাম আরব মহাদ্বীপে বিজয় লাভ করেছিল। তাঁর মৃত্যুর ৯ বছরের ভিতর সমগ্র আরবে মুসলমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

আরও একটি বিশেষত্ব যা প্রকাশ্যে আসে সেটি হল , আঁ হযরত (সা.)এর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মদিনার সর্বময় কর্তা হওয়ার পরবর্তী জীবনে তাঁর কোনও পার্থক্য ছিল না। মক্কা জীবনের অসহায় ও দুর্দশার যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর যে জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল, মদিনার সম্রাট হওয়ার পরও তাতে কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। অপরদিকে পারস্য সম্রাটের বৈভব ও মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির প্রভাব সমগ্র এশিয়াতে ছিল।রোম সাম্রাজ্যও নিজের প্রাচ্যসুলভ প্রতাপ ও আর ভোগবিলাসের নমুনা পেশ করছিল। আর এই দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের মাঝে পড়ে আরবের গোত্রগুলি এদের দাসত্বে থেকেও নিজেদের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি ঔদ্ধত্যপূর্ণ গর্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করছিল।

এমন পরিবেশে হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) এর অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনে কোনও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় নি। বরং তাঁর সাহাবা এবং মদিনার জনগণের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চিন্তায় নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের আরও বেশি অস্বচ্ছলতাপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করেছেন। দৈনন্দিন গৃহকর্মের জন্য কোনও ভৃত্য রাখেন নি, নিজেই সব কাজ করতেন। হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করা হয় যে, নবী করীম (সা.) বাড়িতে কি কি কাজ করতেন? তিনি (রা.) উত্তরে বলেছিলেন-

يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ اَهْلِهٖ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ সংসারের কাজে সাহায্য করতেন আর নামাযের সময় হলে নামাযের জন্য বাইরে চলে যেতেন।

(বুখারী, কিতাবুস সালাত)

কি অসাধারণ নমুনা! কেউ বাদশা হয়েও গৃহকর্মের জন্য কোনও ভৃত্য রাখেন এই নমুনা দেখিয়েছেন এমন মানুষ কি দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে? অথচ আরব দেশের বাদশাহ হওয়ার পর তিনি অভাবীদের মাঝে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং পালের পাল পশু বিতরণ করে দিতেন। একবার রসুল করীম (সা.)-এর কাছে সত্তর হাজার দিরহম হাতে আসে। অপর এক রেওয়াতে নব্বই হাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দিরহমগুলিকে তিনি মাদুরের উপর রাখার নির্দেশ দিয়ে বিতরণ করার জন্য উঠে দাঁড়ান এবং সেগুলি পুরোপুরি বিতরণ করেই ক্ষান্ত হন।

(আল ওফা বি আহওয়ালিল মুস্তফা বিন আল জাজযি, পৃ: ৪৪৭)

একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এলে তিনি তাকে এক উপত্যকা ভর্তি ছাগলের পাল দান করে দেন। সেই নবদীক্ষিত মুসলিম তাঁর নিকট উপত্যকার মাঝের জমিটিও চেয়ে বসে। তিনি (সা.) তাকে চারণভূমি, ছাগলের পাল-সব কিছুই দান করে দেন। সেই ব্যক্তি নিজের জাতির দিকে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার জাতি! তোমরা সকলে মুসলমান হয়ে যাও, মহম্মদ মুস্তফা (সা.) এতটাই দানশীল যে, তিনি অনাহার যাপনকে কখনও ভয় করেন না।

(মাজমায়েয যোয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৩)

কিন্তু তিনি সব সময় নিজেকে এবং নিজ পরিবারকে রাজকোষের অর্থ নেওয়া থেকে সংবরণ করেছেন। এমনকি একবার তাঁর নাতি হযরত ইমাম হোসেন (রা.) শৈশবে খেজুরের স্তুপ থেকে দু-একটি খেজুর মুখে দিলে আঁ হযরত (সা.) তৎক্ষণাত তাঁর মুখে নিজে আঙুল দিয়ে সেই খেজুর বরে করে দিয়ে বলেছেন, 'এগুলো সদকার খেজুর, যা আমাদের জন্য বৈধ নয়।'

হযরত আয়েশা (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর ভাগ্নে হযরত আরওয়াহ (রা.) কে বলেন,' ভাগ্নে! আমাদের এমন সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যখন একের পর এক তিনটি হিলাল (প্রথম দিনের চাঁদ) আমরা দেখতাম, অর্থাৎ দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে যেত, কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর বাড়ির উনোনে হাঁড়ি চড়ত না। হযরত উরওয়া বলেন, আমি বললাম, খালা! আপনারা তখন কি খেতেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন, 'আসওয়াদান' অর্থাৎ খেজুর ও পানি খেয়ে কাটাতাম। কেবল এতটুকু সুরাহা ছিল যে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিবেশী আনসারদের দুগ্ধবতী ছাগল ছিল, যাঁরা আঁ হযরত (সা.) কে উপহার হিসেবে দুধ দিয়ে যেতেন যা তিনি আমাদেরকে খাওয়াতেন।

আঁ হযরত (সা.) এর প্রিয় কন্যা সৈয়্যদাতুন নিসা হযরত ফাতিমা (রা.) -এর হাতে জাঁতা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফোসকা পড়ে যেত। তিনি যখন জানতে পারলেন যে , আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট কিছু ক্রীতদাস এসেছে, তখন তাঁর মনে বাসনা জাগল যে যদি তাকেও একটি ক্রীতাদাস দেওয়া হত, তবে বাড়ির কাজকর্মে কিছু সুবিধা হত। আঁ হযরত (সা.) রাত্রিতে কন্যা ও জামাতার ঘরে পৌঁছলেন। তিনি তাদের উভয়ের মাঝখানে বিছানাতেই বসে তাদের স্নেহভরে বুঝিয়ে বললেন, 'তোমাদের কি এমন একটি বিষয় বলব না, সেই বিষয়ের থেকে উত্তম যা তোমরা যাচনা করেছ? সেটি হল এই যে, যখন তোমরা বিছানায় শুয়ে থাক তখন ৩৩ বার সুবহ্নাল্লাহ্ , ৩৩ বার আলহামদোলিল্লাহ্ এবং ৩৪আল্লাহু আকবার বার পাঠ করবে। এটি তোমাদের জন্য সেবক পাওয়ার থেকে শ্রেয়।

আর এটিও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে কেবল রাজকোষের অর্থই থাকত না যা থেকে তিনি নিজের জন্য খরচ করাকে পাপ বলে মনে করতেন, বরং তাঁর নিজের জন্যও অনেক সম্পদ আসত, সাহাবাগণ তাদের নিষ্ঠা ও অনুরাগের কারণে অনেক উপহার নিবেদন করতেন আর তাঁরা আকাঙ্খা করতেন যে হুযুর (সা.) নিজের এবং পরিবারের জন্য যেন সেই সম্পদ খরচ করেন। আঁ হযরত (সা.) যদিও বা কখনও তাঁর অবর্তমানে পরিবার ও সন্তান সন্ততির কথা চিন্তা করে কিছু অর্থকড়ি বা সম্পত্তি একত্রিত করে ফেলতেন, তবে এতে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) এর মৃত্যুর সময় তাঁর বাড়ির যে অবস্থা ছিল তার আমরা তার চিত্র দেখতে পাই আমর বিন হারিস (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েতে। তিনি বলেন, রসুল করীম (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় কিছুই রেখে যান নি, না কোনও দিরহাম ও দিনার, না কোনও দাস -দাসী। তিনি রেখে গিয়েছিলেন কেবল নিজের সাদা খচ্চর, অস্ত্র এবং সেই জমির টুকরোটি যা তিনি ইতিপূর্বেই সদকা করে দিয়েছিলেন।

হযরত সাহাল বিন সাআদ বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) সাত দিনার আয়েশার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলেন, আয়েশা! সেই যে স্বর্ণমুদ্রা তোমার কাছে ছিল সেটার কি হল? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার কাছে আছে।' তিনি (সা.) বললেন, ওটা সদকা করে দাও। একথা বলেই তিনি সম্বিৎ হারান আর হযরত আয়েশা (রা.) তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সম্বিৎ ফিরে পেতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'সেই সোনাটুকু কি সদকা করে দিয়েছ? তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, এখনও করি নি। তিনি সেই দিনারগুলি চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে গণনা করলেন, অতঃপর বললেন, 'মহম্মদের স্বীয় প্রতিপালকের উপর কিসের আস্থা থাকল যদি খোদার সঙ্গে সাক্ষাত এবং পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় এই দিনারগুলি তার কাছে থেকে যায়।' এরপর তিনি সেই দিনারগুলি সদকা করে দেন আর সেই দিনই তাঁর মৃত্যু হয়।

(মাজমায়েয যোয়ায়েদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৪)

اَللّٰهُم صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আঁ হযরত (সা.)-এর প্রাণদাস ও একনিষ্ঠ সেবক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর জীবনের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন-

'খোদা তা'লা তাঁর অপরিমেয় ধনভাণ্ডারের দরজা আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য উন্মুক্ত করেছেন। আর আঁ হযরত (সা.) সেই সব কিছু খোদার পথে খরচ করেছেন। কোনও প্রকার ভোগবিলাসিতায় বিন্দুমাত্র খরচ করেন নি। তিনি কোনও অট্টালিকাও তৈরী করেন নি আর কোনও প্রাসাদ ও নির্মাণ করেন নি। বরং একটি ছোট্ট মাটির কুটিরে, যেটিকে গরীবের কুটিরের থেকে বেশি কিছু বলা যাবে না, সেখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি অসৎ আচরণ করেছেন, তিনি তাদের প্রতি সদাচারী হয়ে দেখিয়েছেন। আর যারা তাঁকে মর্মপীড়া দিয়েছে, তাদেরকে তিনি বিপদের সময় নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে তুষ্ট করেছেন। শোয়ার অধিকাংশ সময় মাটিই ছিল তাঁর বিছানা আর থাকার জন ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আর খাদ্য বলতে যবের রুটি কিম্বা অনাহার যাপন। জাগতিক সম্পদ বিপুল হারে তিনি লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর পবিত্র হাতদুটিকে জাগতিকতার কলুষে কলুষিত হতে দেন নি। তিনি সর্বদা সম্পদহীনতাকে সম্পদশীলতার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর জন্ম থেকে আমৃত্যু তিনি এই সব ধনসম্পদকে তুচ্ছ মনে করেছেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৭৬-২৯২)

অতএব, যে কোনও রাষ্ট্রের নেতা ও প্রশাসকদের জন্য আঁ হযরত (সা.)এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের এই চিত্র আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এটি ছাড়া তারা জনসাধারণের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

বর্তমান যুগের প্রশাসকদের, এমনকি মুসলমান প্রশাসকদের দ্বারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থের জন্য রাজকোষ থেকে লাগামহীনভাবে

অর্থসম্পদ কুরবানীর গুরুত্ব

আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবন চরিতের আলোকে।

মূল (উর্দু): রফিক আহমদ বেগ, নাযির বায়তুল মাল আমাদ, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান।

সম্মানীয় সভাপতি মহাশয় এবং শ্রেতৃবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।

আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল ' আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবা ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর আলোকে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে, অতঃপর, তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বনেন্ধ পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (আল বাকারা: ২৬২)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (سورۃ البقرہ آیت 266)

এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং তাহাদের দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। এবং যদি উহাতে প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহা হইলে অল্প বৃষ্টিই যথেষ্ট এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে সম্যক দ্রষ্টা।

(আল বাকারা: ২৬৬)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে বলেছেন-, আল্লাহ্র পথে অর্থসম্পদ ব্যায়কারী কখনও ধ্বংস হয়ে যায় না আর তার কোনও ক্ষতি হয় না। বরং তার সম্পদে প্রভূত উন্নতি দান করা হয়। যেভাবে একটি শস্যদানা মাটিতে বপিত হলে তার সাতটি সিস বের হয় আর প্রত্যেকে শিশে একশটি দানা হলে মোট সাতশটি দানা বের হয়। বরং আল্লাহ্ চাইলে আরও বেশি বের হতে পারে। আর অধুনা বিজ্ঞানের যুগের এটা প্রমাণ হয়েছে যে, একটি দানা থেকে কয়েশ দানা উৎপাদন সম্ভব।

এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদেরকে আশ্বস্ত করেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে কোনও পুণ্যকর্মে সম্পদ খরচ কর,তবে তোমাদের সম্পদ হ্রাস পাবে না। কখনও বাগান নষ্ট হবে না, কখনও ব্যবসা নষ্ট হবে না আর কোনও ক্ষতির মুখ দেখবে না। বরং প্রত্যেক কাজে অসধারণ বরকত লাভ করবে।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! প্রাথমিক যুগের মোমেনরা আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অনুধাবন করে এর বরকত থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে যা সম্পর্কে সংক্ষেপে এই আয়াত দুটিতে বর্ণিত হয়েছে। আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবারা নিজেদের অনন্যসাধারণ কুরবানী ও আত্মত্যাগ এবং পাগলপারা ভালবাসার সেই মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসায় বিলীন ও বিভোর হয়ে বিশ্ববাসীর জন্য এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। তাঁরা নিজেদের কর্মধারা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সত্যিই আঁ হযরত (সা.)-এর যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অমূল্য যুগ ছিল কেননা তাঁরা ছিলেন সেই সব সাহাবা যাঁরা আল্লাহ্ তা'লার আহ্বান يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ এর সাড়া দিয়ে বলেছিলেন, আমরা আল্লাহ্র দ্বীনের সাহায্যকারী। আর এইভাবে তাঁরা আ হযরত (সা.)-এর চরণকমলে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

যখন অর্থ সম্পদের কুরবানীর জন্য আহ্বান করা হয়েছে সাহাবারা দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে যা কিছু পেয়েছেন আঁহযরত (সা.)-এর সমীপে তা উপস্থাপন করেছেন। পুণ্যকর্মে তারা একে অপরের প্রতিযোগিতা করতেন। একবার একবার হযরত আবু বাকার (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) বাড়ি থেকে সম্পদ নিয়ে এলে রসুলুল্লাহ্ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, হে উমর! তুমি কি নিয়ে এসেছ? তিনি উত্তর দিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ! আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এসেছি। অনুরূপভাবে হযরত আবু বাকার (রা.)কেও জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, 'হে রসুলুল্লাহ্ (সা.)! আমি আমার বাড়ির সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছি আর বাড়িতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের স্মরণ রেখে এসেছি।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ এর কাছে খুব সম্পত্তি ছিল। তিনি ভীষণ অভাব অনটনে পরিবারের অন্ন সংস্থান করতেন। কিন্তু এক সময় যখন ইসলামের অর্থ সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল আর যার জন্য চাঁদা দেওয়ার আহ্বান করা হল, তখন যদিও তাঁর কাছে খুব নগণ্য পরিমাণ সম্পদ ছিল, কিন্তু হৃদয়ে ঈমানের উদ্দীপনা ছিল, তাই তিনি ঈমানের তাড়নায় যা কিছু ছিল সবই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলেন। তাঁর পিতা আঁ হযরত (সা.)এর কাছে অভিযোগের সুরে একথার উল্লেখ করলে আঁ হযরত তাঁকে ডেকে বললেন, খোদা তা'লা তোমার দান গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এখন তোমার পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তুমি এটি গ্রহণ কর।

হযরত তালহা (রা.) সতেরো আঠারো বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেন। কিন্তু অর্থসম্পদের কুরবানীর নিরিখেও তিনিও কারো থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না। তাঁর সংকল্প ছিল, যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য নিজের সম্পদ উপস্থাপন করবেন। এই সংকল্পে তিনি আজীবন অবিচল ছিলেন। তবুকের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের মধ্যে কম বেশি সকলকেই অস্বচ্ছলতার মধ্যে দিনাতিপাত করছিল। তাই যুদ্ধ সরঞ্জামের জন্য ভীষণ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। সেই সময় তিনি এক মোটা অংকের অর্থ উপস্থাপন করেছিলেন, যার দরুন আঁ হযরত (সা.) তাঁকে 'ফায়ায' (অতীব দানশীল) উপাধিতে ভূষিত করেন।

যখন কুরআন করীমের

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ

এই আয়াতটি নাযেল হল- অর্থাৎ কিছু মানুষ এমন আছে যারা খোদার সঙ্গে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে' তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, তালহা, তুমিও সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

আয়াতটি নাযেল হল, তখনও তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে বেইরে জা বাগানটি রসুলুল্লাহ (সা.)এর সমীপে নিবেদন করেন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ যৌবনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বড় মাপের ব্যবসায়ী এবং অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের মোহ মোটেই ছিল না। বরং সম্পদকে তিনি খোদার রাস্তায় খরচ করেই আনন্দ পেতেন। একবার তাঁর বণিকদল মদিনায় সাতশ উটের পিঠে করে গম, আটা এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসে। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল। মদিনায় এ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আঁ হযরত (সা.) বলতেন আব্দুর রহমান বিন অউফ জান্নাতে বুকের উপর ভর করে প্রবেশ করবেন। এই কথাটি হযরত আব্দুর রহমানের কানেও পৌঁছল। তিনি তখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন- আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এই পুরো বাণিজ্য দলটিকে এর পুরো সম্পদ সহ, এমনকি এর গদিগুলিও আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করলাম।

মৃত্যুর সময়ও তিনি পঞ্চাশ হাজার দিনার এবং এক হাজার ঘোড়া খোদার পথে উৎসর্গ করার ওসীয়্যত করে যান। এছাড়াও সেই সময় বদরী সাহাবাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য চারশ দিনার করে ওসীয়ত করেন। বর্ণিত আছে যে, সেই সময় পর্যন্ত এক বদরী সাহাবী জীবিত ছিলেন আর তাঁরা প্রত্যেকেই সানন্দে এই ওসীয়্যত থেকে উপকৃত হন, এমনকি হযরত উসমানও (রা.) এর থেকে অংশ পান।

হযরত উসমান ৩৪ বছর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। মক্কা থেকে হিজরত করে মুসলমানেরা যখন মদিনায় চলে আসে তখন পানির সংকট চরমে ছিল। বেইরে রওমা নামে কেবল একটিই জলকূপ ছিল যার পানি সুপেয় ছিল। কিন্তু সেটিও ছিল এক ইহুদীর মালিকানায় যে কিনা অর্থের বিনিময়ে পানি বিক্রি করত। অপরদিকে সাহাবাদের আর্থিক সঙ্গতি এমন ছিল না যে অর্থের বিনিময়ে পানি কিনে খাবে। তাই হযরত উসমান (রা.) সেই জলকূপটি সেই ইহুদীর কাছ থেকে কুড়ি হাজার দিরহাম মূল্যে কিনে নিয়ে সকলের জন্য উৎসর্গ করেন।

আঁ হযরত (সা.) যখন তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন তখন মুসলমানদের চরম আর্থিক সংকট চলছিল। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম জোগাড় করা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছিল। তিনি সাহাবাদেরকে আর্থিক সাহায্যের আহ্বান জানালে হযরত উসমান (রা.) দশ হাজার যোদ্ধাকে নিজের খরচে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন আর তাদের জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও নিজের পয়সায় কিনে দিলেন। এছাড়াও এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া এবং জরুরী রসদের জন্য নগদএক হাজার দিনার দান করেন।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণের পাশাপাশি মহিলা সাহাবীয়ারাও অর্থ সম্পদের কুরবানী কোনও ত্রুটি রাখে নি। তারা নিজেদের হৃদয়ের টুকরো যেখানে ইসলামের বিজয়ের জন্য উপস্থাপন করেছে, তেমনি নিজেদের প্রিয়তম বস্তু অর্থাৎ সম্পদ গয়নাগাটিও খোদার পথে অকুণ্ঠভাবে ব্যয় করেছে। উম্মুল

মোমেনীন হযরত সওদা (রা.) সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেন- দীর্ঘ হাতবিশিষ্ট আমার সঙ্গে জান্নাতে সর্ব প্রথম সাক্ষাত করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সব থেকে বেশি ব্যয়কারী। এর থেকে জানা যায় যে, খোদার পথে ব্যয় করা খোদা এবং তাঁর রসুলে নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের কারণ হয়।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! কুরবানী ও আত্মত্যাগের এই স্পৃহা যতদিন সাহাবা এবং পরবর্তীতে তাঁদের অনুসারীদের মাঝে ছিল, ততদিন মুসলমানদের উন্নতির ধারা অব্যাহত ছিল আর তারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভ করতে থেকেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের তিনশ বছর পর এক অন্ধকারের যুগ শুরু হয় যা এক হাজার বছর সময়কালে শিখরে পৌছল আর আঁ হযরত (সা.)-এর কথা মত ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকল, কুরবানী তথা আত্মত্যাগের চেতনা বিলুপ্ত হল। প্রকৃত ঈমান পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলে পৌঁছে গেল, তখন খোদার করুণাবারি উদ্বেলিত হল আর কুরআন করীমে বর্ণিত এই স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ

অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই মহম্মদী মসীহ ও মাহদীকে পৃথিবীতে পাঠালেন যাঁর মাধ্যমে ইসলামের বিশ্বজনীন বিজয় অবধারিত ছিল। তিনি এমন এক সময় এসেছেন যখন কি না পৃথিবীর সর্বত্র পথভ্রষ্টতা বিরাজ করছিল আর অপশক্তিগুলি ইসলামকে দুর্বল করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতারণার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছিল। ইসলাম তথা আঁ হযরত (সা.) দ্বারা আনীত ঐশী জ্যোতিকে নির্বাপিত করতে তারা কোনও কৌশল বাকি রাখে নি। এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে কাদিয়ানের এক অখ্যাত জনপদে হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং তাঁর প্রতি সব থেকে বেশি দরুদ প্রেরণকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর আবির্ভাব হল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সুসংবাদ দিলেন, আমি তোমার নাম খ্যাতির সহিত পৃথিবীতে প্রসার করব, এমনকি বাদশাহরা পর্যন্ত তোমার পরিধান থেকে আশিস অন্বেষণ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের পূর্ণতার জন্য এই সংবাদও দান যে, তোমাকে বিশ্বস্ত ও আত্মনিবেদিত এক পবিত্র জামাতও দান করব। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এই সুসংবাদও দান করেন যে, সেই সব লোকেরা তোমার সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমি নিজের পক্ষ থেকে ইলহাম করব।

'মুবারক ও জো আব ঈমান লায়া সাহাবা সে মিলা যব মুঝকো পায়া'

অর্থাৎ ধন্য তারা যারা এখন ঈমান এনেছে/ যারা আমাকে পেয়েছে তারা সাহাবাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর ন্যায় হযরত মৌলানা হাকীম নুরুদ্দীন (রা.), যিনি সর্বপ্রথম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি নিজের অসাধারণ নিষ্ঠা এবং আত্মত্যাগের কারণে প্রথম খলীফার পদে আসীন হন। তিনি (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন-

'আমি আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমার যা কিছু আছে তা আমার নয়, আপনার। হযরত পীর ও মুরশিদ! আমি সত্যি সত্যি বলছি, আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ যদি ধর্মের প্রচারে ব্যয় হয় তবে আমার জীবন স্বার্থক হবে। '

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

হযরত মসীহ মওউ (আ.) তাঁর সেবার প্রতি সংবর্ধনা জানিয়ে বলেন-

'তিনি ইসলামের বাণীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর বৈধ ধন-সম্পদ ব্যয় করে এমন কোন কোন ধর্মীয় সেবা করেছেন , যা আমি সব সময় ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখি আর ভাবি, এই সব সেবাগুলি যদি আমার দ্বারাও সম্পাদিত হত! ..... আমার পথে ধন-সম্পদ কেন বরং প্রাণ ও সম্মানও উৎসর্গ করে দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন।

(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫)

হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেবের ন্যায় কুরবানী এবং ধর্ম সেবার স্পৃহা পালনকারী অসংখ্য বুজুর্গ ছিলেন, যাদের সকলেরই বাসনা ছিল, যদি তাদের সমস্ত সম্পদ ধন-সম্পদ ধর্মের প্রচারে খরচ হত! হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং বলেন-

"আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার জামাতের অন্তত এক লক্ষ মানুষ এমন আছেন যারা আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মশীল। ..... আমি দেখছি আমার জামাত যতটা পুণ্যের কাজে উন্নতি করেছে সেটাও একটা মোজেজা বা নিদর্শন। হাজার হাজার নিবেদিত প্রাণ মানুষ রয়েছে। তাদেরকে যদি বলা হয়, তোমরা নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ থেকে ছেড়ে দাও তবে তার তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫০)

তারিখে আহমদীয়াতে এমন আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধর্মীয় কাজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নিজেদের সর্বস্ব হযরত আকদাসের পদতলে সঁপে দিয়েছেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লেখেন- একবার হযরত মসীহ মওউ (আ.)-এর লুধিয়ানায় একটি ইশতেহার ছাপানোর জন্য ৬০ টাকার প্রয়োজন হয়। সেই সময় তাঁর এক সম্মানীয় সাহাবী হযরত মুনশী যাফর আহমদসাহেব (রা.) লুধিয়ানা আসেন। হুযুর (আ.) তাঁকে ডেকে পাঠান এবং বলেন- এই মুহূর্তে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে পড়েছে। আপনার জামাত কি এতটা অর্থের ব্যবস্থা করতে পারবে? তিনি বললেন, হযরত! ইনশাআল্লাহ্ করতে পারবে। আমি গিয়ে টাকা নিয়ে আসছি। তিনি অবিলম্বে কপুরথলা গিয়ে জামাতের কোনও সদস্যকে কিছু না বলেই স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে পাওয়া ষাট টাকা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে পেশ করেন।

(আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৭)

এই রেওয়ায়েতটি দীর্ঘ। যেহেতু মুনশী যাফর আহমদ সাহেব একা এই সেবাটি করেছিলেন, কপুরথলা জামাতের অন্যান্য সদস্যদেরকে এই পুণ্যের ভাগীদার হওয়ার সুযোগ দেন নি, তাই পরবর্তীকালে এই ঘটনা জানতে পেরে সেই জামাতেরই সদস্য মুনশী আরোড়া খান সাহেব ছয় মাস পর্যন্ত মুনশী যাফর আহমদ সাহেবের প্রতি ক্ষুন্ন থাকেন। এই জন্য যে তিনি তাদেরকে অর্থসম্পদের কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। এরাই ছিলেন সেই সব নিবেদিত প্রাণ সদস্য যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সদস্য ছিলেন।

হযরত আম্মা জান সৈয়্যদাহ নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাঁর দিল্লীর একটি বাড়ি বিক্রি করে সেই টাকা পরিশোধ করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের আহ্বান করেন তখন হযরত মিঞা শাদি খান সাহেব সিয়ালকোটি বাড়ি চারপাই রেখে বাকি সব কিছু তিনশ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সমস্ত টাকা চাঁদায় দিয়ে দেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- মিঞা শাদি খান, কাঠের ব্যবসায়ী, সাকিন সিয়ালকোট। সম্প্রতি তিনি একটি কাজে দেড়শ টাকা চাঁদা দিয়েছেন আর এখন এই কাজের জন্য দুশো টাকা চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি সেই খোদা নির্ভর মানুষ, যার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র দেখা গেলে তা পঞ্চাশ টাকার বেশি হবে না। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন- 'যেহেতু দুর্ভিক্ষের সময়, ব্যবসা বাণিয্যে স্পষ্ট পতন পরিলক্ষিত হচ্ছে,তাই ভাবলাম ধর্মীয় করা ব্যবসা করা শ্রেয়। অতএব, যা কিছু আমার কাছে ছিল সব পাঠিয়ে দিলাম।" বস্তুত তিনি সেই কাজ করেছেন যা হযরত আবু বাকার করেছিলেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৯, প্রকাশকাল: ২০১৯)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) হযরত ডক্টর খলীফা রশীদুদ্দীন সাহেব (রা.) সম্পর্কে বলেন- তিনি অর্থ সম্পদ কুরবানী করার নিরিখে অগ্রনী ছিলেন, এতটাই যে, হযরত সাহেব তাঁকে এই মর্মে লিখিত শংসাপত্র দেন যে আপনার আর কুরবানীর প্রয়োজন নেই। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সেই যুগের কথাও স্মরণ আছে যখন তাঁর গুরদাসপুরে মুকদ্দমা চলছিল আর তাতে অর্থের প্রয়োজন ছিল। হযরত সাহেব বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেন, যেহেতু খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে- দুটি জায়গায় লঙ্গর খানা চলছে- একটি কাদিয়ানে অপরটি এখানে। তাছাড়া মুকদ্দমায় খরচ হচ্ছে। অতএব, বন্ধুরা সহায়তার প্রতি দৃষ্টি দিন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই আবেদনের কথা ডক্টর সাহেবের কানে পৌঁছল। আর ঘটনাক্রমে সেই দিনই তিনি প্রায় ৪৫০ টাকা বেতন পান। তিনি পুরো বেতনের টাকা তৎক্ষণাৎ হযরত সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর এক শুভাকাঙ্খী বললেন, সংসারের প্রয়োজনের জন্যও আপনি কিছু রেখে দিতেন। তিনি উত্তর দিলেন, খোদার মসীহ লিখছেন দ্বীনের জন্য অর্থ প্রয়োজন, তবে আর কোন প্রয়োজনের জন্য রেখে দিব?"

(আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

অনুরূপভাবে হযরত সাহেবযাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব সম্পর্কে হযরত মির্যা আব্দুল হক সাহেব এডভকেট লেখেন, 'হযরত সাহেব যাদা পীর মঞ্জুর আহমদ সাহেব ইয়াসসারনাল কুরআন কায়েদার সংকলক ছিলেন। এই কায়েদাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই যুগে মাসে শয়ে শয়ে টাকা তাঁর উপার্জন ছিল। কিন্তু ধর্মের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত অসাধারণ ছিল। তিনি মাসে ত্রিশ টাকা নিজের খরচের জন্য রেখে বাকি অর্থ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর নিকট কুরআন করীমের প্রকাশনা এবং ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ১৯৪০ সালের পর যখন মূল্যবৃদ্ধি শুরু হল, তখন তিনি ৪০ টাকা করে রাখতেন। আর বছরে দশ হাজার টাকা ধর্মসেবার জন্য দান করেছেন।"

(মাসিক আনসারুল্লাহ্ পত্রিকা, রাবোয়া, এপ্রিল, ১৯৬৯)

সুধী পাঠকবর্গ! অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে হৃদয়ের ভাবাবেগ দুরে সরিয়ে রেখে খোদার পথে অর্থ সম্পদ ত্যাগ করা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। আহমদীয়াতের ইতিহাসের এর অসংখ্য উদাহরণ জ্বলজ্বল করছে। হযরত কাযি মহম্মদ ইউসুফ সাহেব পেশাওয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন-

"উজিরাবাদের শেখ পরিবারের এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার পিতা কাফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লঙ্গর খানার খরচের জন্য আবেদন করেন। তাঁর কাছেও চিঠি যায়। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে অর্থ পাঠানোর পর লেখেন আমার যুবক ছেলে প্লেগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আমি তার দাফন ও কাফনের জন্য ২০০ টাকা সঞ্চিত রেখেছিলাম যা আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ছেলেকে তার পরনের কাপড়ে দফন করছি।'

(পত্রিকা- জহুরে আহমদ মওউদ, পৃ: ৭০-৭১)

হযরত ইয়াকুব আলি সাহেব ইরফানি সাহেব (রা.) লেখেন- আমি সেই দৃশ্যটি কখনও ভুলতে পারি না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছিল মাত্র। একদিন কেউ আমাকে বাইরে থেকে ডাকল।গৃহপরিচারিকা বা কোনও শিশু বলল, বাইরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আপনাকে ডাকছেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখি হযরত মুনশী আরোড়া খান সাহেব মরহুম দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। এরপর পকেট থেকে দুই বা তিন পাউন্ড বের করে বললেন, এটা আম্মা জানকে দিয়ে দিবেন আর একথা বলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর ক্রন্দনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন ছাগল জবাই করা হচ্ছে। আমি কিছুটা আশ্চর্য হলাম যে তিনি কাঁদছেন কেন? কিন্তু আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম যে তিনি চুপ করলে তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইব। তিনি কিছুটা সামলে উঠলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলা, আপনি কাঁদছিলেন কেন? তিনি বললেন, আমি দরিদ্র ব্যক্তি ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি ছুটি পেতাম কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তাম। বহু পথ পায়ে হেঁটেই পার করেছি, যাতে জামাতের সেবার জন্য কিছু অর্থ সাশ্রয় হয়। তবুও দেড়-দুই টাকা খরচ হয়ে যেত। এখানে এসে যখন দেখলাম যে বিত্তবানরা জামাতের সেবায় বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, তখন আমার মনে এই বাসনার উদ্রেক হল যে, আমার কাছেও যদি টাকা থাকত তাহলে আমিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর জন্য রৌপের উপহারের পরিবর্তে স্বর্নের উপহার নিয়ে আসতাম। অবশেষে আমার বেতন কিছুটা বাড়ল। (সেই সময় সম্ভবত তাঁর বেতন কুড়ি পচিশ টাকা ছিল) আমি প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা সঞ্চয় করতে শুরু করলাম। আমি সংকল্প করেছিলাম যে সঞ্চিত অর্থ আমার কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছে গেলে তাকে পাউন্ডে বদলে নিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সমীপে উপস্থাপন করব। আর পাউন্ড আমার কাছে জমা হলে..... এইটুকু বলেই তিনি পুনরায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করলেন। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতেই বললেন- আমার কাছে যখন পাউন্ড জমা হয়ে গেল তখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যু এসে উপস্থিত হল।

এই নিষ্ঠা কি অসাধারণ নমুনা ছিল। এক বক্তি যে চাঁদাও দেয়, কুরবানীও করে, মাসে একবার দুইবার নয় বরং তিন বার জুমা পড়তে কাদিয়ান পৌঁছে যায়, জামাতের পত্রিকা এবং বই-পুস্তকও কেনে, সামান্য বেতন হওয়া সত্ত্বেও, অথচ আজকের দিনে অনেক বেশি বেতন হওয়া সত্ত্বেও সেই কুরবানীর এক দশমাংশ বা এক বিংশাংশও কুরবানী করে না- তার মনে এই ধারণার উদ্রেক হচ্ছে যে, ধনীরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে স্বর্ণমূদ্রা উপহার দিচ্ছে, সেখানে আমি কেন পিছিয়ে থাকব? তাই তিনি যৎসামান্য বেতন পেয়েও তিলে তিলে সঞ্চয় করতে থাকেন। সেই যুগে তিনি ও তার পরিবার যে কি অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়েছে তা বোঝা দুষ্কর। এর কেবল একটাই কারণ ছিল, উদ্দেশ্য ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে স্বর্ণমূদ্রা উপহার দেওয়া। কিন্তু যখন তার বাসনা পূর্ণ হওয়ার সময় এল, আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা তাঁকে তাঁর কাঙ্খিত সুখানুভব থেকে বঞ্চিত করল। (আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- আমার এমনই একজন আন্তরিক বন্ধু হলেন মৌলবী মহম্মদ আহসান সাহেব আমরোহি, যিনি জামাতের সমর্থনে উৎকৃষ্ট মানের পুস্তকাবলী রচনায় ব্যস্ত থাকেন। আর সাহেবযাদা পীর জি সিরাজুল হক সাহেব হাজার হাজার মুরীদদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে এসে দরবেশসুলভ জীবনযাপনকে বরণ করেছেন আর মিঞা আব্দুল্লাহ্ সাহেব সানোরী এবং মৌলবী বুরহানুদ্দীন সাহেব ঝিলমি এবং মৌলবী মুবারক আলি সাহেব সিয়ালকোটি এবং কাযি যিয়াউদ্দীন সাহেব কাযি কোটি এবং মুনশী চৌধরী নবী বখশ সাহেব বাটালা জেলা গুরদাসপুর এবং মুনশী জালালুদ্দীন সাহেব বিলানী ও প্রমূখরা নিজেদের সাধ্যমত সেবারত আছেন। আমি জামাতের প্রতি ভালবাসা এবং নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হয়েছি, কেননা তাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই, যেমন মিঞা জামালুদ্দীন এবং খায়রুদ্দীন এবং ইমামুদ্দীন কাশ্মীরি আমার পাশের গ্রামেরই বাসিন্দা। এই তিন হতদরিদ্র ভাইয়েরাও, যারা হয়তো প্রত্যহ তিন আনা বা চার আনার বিনিময়ে দিনমজুরের কাজ করেন, তারাও অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে চাঁদায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের বন্ধু মিঞা আব্দুল আযিজ পটওয়ারীর নিষ্ঠাও দেখেও আমি আশ্চর্য হই। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও একদিন একশ টাকা দিয়ে গেল আর বলে গেল আমি চাই এই টাকা খোদার রাস্তায় খরচ হোক। এই একশ টাকা সেই হতদরিদ্র হয়তো কয়েক বছরে সঞ্চয় করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বয়ং খোদা তা'লাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।"

(আঞ্জামে আথম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩১৩-৩১৪)

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার এক অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত চৌধুরী মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের। ষাটের দশকে লন্ডন মিশন হাউসে এই প্রস্তাবনা রাখা হয় যে, জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের বর্তমান কেন্দ্রের দুটি ভবনকে (যেগুলি অনেক পুরোনো হয়ে পড়েছিল) ভেঙে একটি বড় কমপ্লেক্স তৈরী করা হোক, যার মধ্যে থাকবে একটি বড় হলঘর, অফিস কক্ষ, দুটি বাসভবন এবং ছোট থাকার মত ফ্ল্যাট। এই নির্মাণ প্রকল্পের জন্য সেই সময় যে খরচ ধরা হয়েছিল তা ছিল প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড যা জামাতের কাছে ছিল না। অনেক চিন্তাভাবনা এবং চেষ্টার পরও যখন কোনও উপায় বের হল না, তখন হযরত চৌধরী সাহেবের কাছে আবেদন করা হয়, 'আপনি কি এই অর্থের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন? পরে আপনাকে কিস্তিতে পরিশোধ করে দেওয়া হবে।' তিনি সম্মত হন। কুরআনী শিক্ষা অনুসারে এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি প্রস্তাব করা হয় যাতে উল্লেখ করা হয় যে চৌধুরী সাহেব জামাতকে এক লক্ষ পাউন্ড দিবেন আর জামাত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ফেরত দিতে দায়বদ্ধ থাকবে। এক সন্ধ্যায় চুক্তির প্রস্তাবিত খসড়া চৌধরী সাহেবকে দেওয়া হল। তিনি জানালেন, আমি ভাল করে চিন্তাভাবনা করার পর আগামী কাল এতে সই করে দিয়ে দিব।

পরের দিন সকালে চৌধরী সাহেব বললেন, আমি এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি এবং সততার সঙ্গে ভেবে দেখেছি। আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলল, জাফরুল্লাহ্ খান! আজ তুমি যা কিছু হয়েছ তা আহমদীয়াতের দৌলতেই। তুমি যা কিছু পেয়েছ তা এই আহমদীয়াতেরই দান। তুমি কি এখন সেই উপকারী জামাতকে কিছু অর্থ ফেরতযোগ্য ঋণ হিসেবে দিতে চাইছ? আমার অন্তরাত্মাকে আমাকে প্রবল ধিক্কার জানাল আর আমি আমার সিদ্ধান্তে যারপরনায় লজ্জিত হলাম আর ইসতেগফার করলাম। সেই মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, প্রয়োজনীয় অর্থ আমি ঋণ হিসেবে নয় বরং এক বিনম্র দান হিসেবে জামাতের জন্য উপস্থাপন করব। তিনি বলেন, তিনি চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে এক লক্ষ পাউণ্ডের একটি চেক জামাতের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেন , হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস ছাড়া অন্য কারো কাছে তাঁর জীবদ্দশায় এই দানের বিষয়ে কেউ যেন কিছু জানতে না পারে। কুরবানী, বিনয় এবং নিষ্ঠার কি অনন্য দৃষ্টান্ত!

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মাঝে অর্থসম্পদের কুরবানীর স্পৃহা এমন মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যে তা নিত্যনতুন পন্থায় প্রকাশ পাচ্ছিল। একটি ছোট্ট উদাহরণ উপস্থাপন করছি যাতে কুরবানীর জন্য অপার আবেগ উপচে পড়তে দেখা যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী ছিলেন সাঁঈ দিওয়ান শাহ সাহেব তাঁর বার বার কাদিয়ান আগমণের হেতু বর্ণনা করে বলেন-

'আমি যেহেতু দারিদ্রক্লিষ্ট, চাঁদা তো দিতে পারি না, তাই কাদিয়ান যাই যাতে অতিথিশালার খাট হয়ে আসি আর এভাবে আমার মাথা থেকে চাঁদা শোধ হয়ে যায়।"

(আসহাবে আহমদ, খণ্ড-১৩, পৃ: ৯)

হযরত বাবু ফকির আলি সাহেব অমৃতসরে ছিলেন। এমতাবস্থায় হুযুরের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায়কারীরা সেখানে পৌঁছে যান। তাঁর কাছে নগদ টাকা তো ছিল না, পাত্রে আধ শের মত আটা ছিল। তিনি সেটুকুই দিয়ে দেন আর সারা রাত্রি তাঁর পরিবার অভুক্ত কাটিয়ে দেয়।

অর্থ সম্পদের কুরবানীর ক্ষেত্রে হযরত মহম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ যে অধ্যায় রচনা করেছিলেন, ধর্মীয় জগতে তার নজির পাওয়া যায় না। আঁ হযরত (সা.)-এর নেতৃত্বে সাহাবাগণ অর্থসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করেছেন যা আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ -এর বিশিষ্ট মর্যদায় ভূষিত করেছেন। কি অসাধারণ মহিমা সেই সব পবিত্র সত্তাদের যাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) বলেছিলেন

اَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِم اقتديتُم اهتديتُم

অর্থাৎ আমার সাহাবারা নক্ষত্র সদৃশ। তোমরা তাদের মধ্যে যে কোনও কাউকে অনুসরণ করবে হিদায়াত লাভ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(আত তওবা-১১২) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নেন যাতে এর বিনিময়ে তারা জান্নাত লাভ করে।

যে ব্যক্তি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, নিজের জীবদ্দশাতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে যায় সে নিশ্চয় নিজের গন্তব্য পেয়ে গেছে। এই আয়াতেরই শেষ ভাগে আল্লাহ্ তা'লা অর্থসম্পদের কুরবানী উপস্থাপনকারী যোদ্ধাদেরকে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় সুসংবাদ দিয়েছেন, যারা আমার সন্তুষ্টির লাভের জন্য নিজেদের

পরিশ্রম দিয়ে উপার্জিত অর্থ কুরবানী কর, আমি তোমাদেরকে বলছি

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ -:

(সূরা তওবা-১১২)

আমাদের দয়ালু খোদার আমাদের উপর কতবড় অনুগ্রহ, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবন দান করেছেন, অর্থ উপার্জনের শক্তি ও সামর্থ দান করেছেন। আর তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহে উপার্জিত অর্থের কিয়দাংশ যখন তাঁর জন্যই খরচ করা হয় তখন খোদা তা'লা, যিনি আমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি এতটাই খুশি হন যে, আমাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। একজন মোমেনের জন্য এর থেকে বড় প্রাপ্তি ও সফলতা আর কি হতে পারে? হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন-

'ইয়ে যার ও মাল তো দুনিয়া মেঁ হি রহ যায়েঙ্গে।

হশর কে রোয জো কাম আয়ে ওহ যার প্যায়দা কার।

অর্থ: এই ধন-সম্পদ তো পৃথিবীতেই থেকে যাবে। সেই সম্পদ তৈরী কর যা বিচার দিবসে কাজে আসবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"এটা স্পষ্ট যে, তোমরা দুটি জিনিসকে ভালবাসতে পার না। যুগপৎ সম্পদকেও ভালবাসবে আর খোদাকেও ভালবাসবে- এটা সম্ভব নয়। কেবল একটি জিনিসকে ভালবাসতে পার। অতএব, সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে খোদাকে ভালবাসে। আর তোমাদের মাঝে যদি কেউ খোদাকে ভালবেসে তাঁর পথে সম্পদ ব্যয় করে, তবে আমার বিশ্বাস, তার সম্পদে অন্যদের তুলনায় বেশি বরকত দেওয়া হবে। কেননা, সম্পদ নিজে থেকে আসে না। বরং খোদার ইচ্ছায় আসে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

তিনি আও বলেন-

"প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজেকে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য এখন সময় যে, সে নিজের অর্থ দ্বারাও এই সেলসেলার খেদমত করে।..... প্রত্যেক বয়াত গ্রহণকারীর নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, যেন খোদাতালাও তাহাদিগকে সাহায্য করেন। যদি বিনাব্যতিক্রমে প্রতিমাসে তাহাদের সাহায্য পৌঁছিতে থাকে- তাহা অল্প সাহায্যই হউক তাহা হইলে উহা ঐরূপ সাহায্য হইতে উত্তম, যাহা কিছুকাল ভুলিয়া থাকিয়া আবার নিজেরই খেয়ালখুশী অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিকতার পরিচয় তাহার খেদমত দ্বারা পাওয়া যায়।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! এখন ধর্মের জন্য এবং ধর্মের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এই সমুদয়কে সৌভাগ্য মনে কর, কারণ পুনরায় কখনও ইহা হাতে আসিবে না।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৮৩)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন- "এই যুগ, যেটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ, এতে একটি জিহাদও রয়েছে যা হল অর্থ সম্পদের জিহাদ। কেননা এটি ছাড়া ইসলামের প্রতিরক্ষায় বই-পুস্তক প্রকাশিত হতে পারবে না। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের অনুবাদ, সেগুলিকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে দেওয়া, মিশন হাউস নির্মাণ, মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিম প্রস্তুত করা, তাদেরকে বিভিন্ন জামাতে পাঠানো, মসজি নির্মাণ- এগুলি কিছুই হত না। এছাড়া স্কুল, কলেজের মাধ্যমে অভাবতাড়িত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া, হাসপাতালের মাধ্যমে আর্ত মানবতার সেবাও করা যেত না। সুতরাং, যতদিন পর্যন্ত না পৃথিবীর প্রতি প্রান্তের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে যায় এবং হতদরিদ্রদের অভাব মোচন হয়, ততদিন অর্থ-সম্পদ কুরবানী করার এই জিহাদ অব্যাহত থাকবে আর নিজের নিজের সুযোগ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত,৩১শে মার্চ, ২০০৬)

সম্মানীয় শ্রোতাবর্গ! আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন-

وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

অর্থ: সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা) শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে।

(আততাবাগুন:১৭)

এই আয়াতে আমাদেরকে নিজেদের হিতার্থে ব্যয় করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। খোদা তা'লা গনী, তাঁর কোনও ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার) -এর ক্ষেত্রে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিন আর এর পরিণামে আমাদেরকে আর্থিক কুরবানীর আশিস ও কল্যাণের অধিকারী করুন। আমীন।

****

অর্থ অপচয়ের যে সব ঘটনা আমরা পড়তে, শুনতে ও দেখতে পাই তা একথায় অবর্ণনীয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক দান করুন। আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আদর্শের সহস্রাংশের উপরও যদি আমল করার তৌফিক পায় তবে জনগণের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সুধী শ্রোতৃবর্গ! আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ইসলামের এই শান্তিদায়ী শিক্ষা এবং মানব হিতৈষী হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর পবিত্র দৃষ্টান্তগুলির ভিত্তিতে অধুনা বিশ্বের উন্নত ও পরাশক্তি দেশগুলির বুকে দাঁড়িয়ে তাদেরকে ন্যায় নীতি এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং বিশ্বজনীন অস্থিরতা, অশান্তি, সন্ত্রাসবাদ এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের যে কালো মেঘ ঘনাচ্ছে তা থেকে রক্ষার পাওয়ার জন্য বিশ্বনেতাদেরকে সতর্ক করে চলেছেন।

সব শেষে আমি সেগুলি থেকে মাত্র দুটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করব। ২০১২ সালের ২৭ শে জুন ওয়াশিংটন ডিসি-র ক্যাপিটল হিলে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) কংগ্রেস সেনেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, হোয়াইট হাউসের সদস্য এবং এবং বেসরকারী সংগঠনের কর্ণধার ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বেরসকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্খা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব্ নেশনস্' প্রতিষ্ঠিতহয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্ব জুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতেরযুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পরএক 'লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যেরকারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতেবিশ্ব জুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেইছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিতছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বেরশান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্যঅর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয়নি।

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ৭৪-৭৫)

অনুরূপভাবে ২০১৩ সালের ১১ই জুন তারিখে লন্ডনের পার্লামেন্ট হাউসে প্রদত্ত ভাষণে বলেন-

"বর্তমান যুগে বিশ্ব শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পারস্পরিক সম্মান এবং প্রত্যেকধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।অন্যথায় এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। ১৩৯ ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্মপৃথিবী একটি বিশ্ব-পল্লীতে পরিণত হয়েছে। তাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং শান্তি প্রসারের জন্য সম্মিলিত না হওয়ার দরুন উদ্ভূত সমস্যাবলী শুধু আঞ্চলিক নগর, পল্লী বা কোন বিশেষ একটি দেশেরই ক্ষতি করবে না, বরং গোটা বিশ্বকেই ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। আমরা বিগত দুটি বিশ্ব-যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। গুটি কয়েক দেশেরভ্রান্ত-নীতির কারণে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের লক্ষণাবলী ফুটে উঠেছে।যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে পশ্চিমা বিশ্বেও এর দীর্ঘমেয়াদী এবং ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে। আসুন আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করি। আসুন আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে যুদ্ধের শোচনীয় ও ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করি। নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা ভয়ানক যুদ্ধ পারমাণবিক যুদ্ধের রূপ নেবে এবং বিশ্ব আজ যে দিকে এগিয়ে চলেছে তাতে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এহেন ভয়ানক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা, সততা এবং বিশ্বস্ততা অবলম্বন করতে হবে, এবং বিশ্ব শান্তিকে ধ্বংস করে ঘৃণা এবংবিদ্বেষ প্রসারকারী দলগুলিকে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিহত করতে হবে। আমি আশা করি এবং দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা পরাশক্তিগুলিকেএ বিষয়ে ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন॥

(বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ, পৃ: ১২৯)

****

সাহাবাদের জীবনচরিত

মূল (উর্দু): মহম্মদ শরীফ কাউসার

সুধী শ্রোতৃবর্গ! আমাকে 'সাহাবাদের জীবনী এবং প্রাথমিক যুগের সাহাবাদের মধ্যে হযরত ইমাম হাসান এবং শেষ যুগে কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব।' সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছে।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর জীবনী।

নবুয়তের খনির এই অমূল্য রত্ন, শান্তির যুবরাজ এবং অশান্তির যম, দুই জাহানের নেতার সুসংবাদকে পূর্ণতা দানকারী রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দৌহিত্র হযরত আলি এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র হিজরী তৃতীয় সনের রমযান মাসে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন আর নবী করীম (সা.) তাঁর কানে আযান দেন।

হযরত আলি বিন আবু তালিব বর্ণনা করেন- যখন হযরত হাসান জন্ম নিলেন তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এসে বললেন, আমার ছেলেকে আমাকে দেখাও, তোমরা ওর নাম কি রেখেছো? আমি বললাম,ওর নাম হারব রেখেছি। হুযুর (সা.) বললেন,হারব নয়, ওর নাম হাসান।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি আযদিন বিল আসীর আবুল হাসান আলি ইবনে মহম্মদ্, পৃ: ৫৫৬-৫৫৭)

শৈশব ও শিক্ষা

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) হযরত হাসান (রা.) সম্পর্কে বলেন- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّهٗ وَاَحِبَّ مَنْ یُّحِبُّهٗ হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস আর যে তাকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাস।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, হাদীস-৪৪৩১, খণ্ড=১৩, পৃ: ৫১)

হুযুর (সা.)-এর স্নেহ ও ভালবাসা

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: আমি নবী করীম (সা.) কে দেখেছি তিনি হযরত হাসান বিন আলিকে কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, একজন এই দৃশ্য দেখে বলল, তোমার বাহন কতই না উৎকৃষ্ট! একথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন- এই আরোহীটিও কত উৎকৃষ্ট মানের।

(আল মুসতাদরাক লিল হাকিম মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস-৪৮৫৯)

হযরত বারিদা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন- হযরত হাসান এবং হোসেন (আ.) ছুটোছুটি করে আসছিল আর তারা দুজনে লাল কুর্তা পরিহিত ছিল। তাদেরকে দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা.) মেম্বার থেকে নীচে নেমে দুজনকে কোলে তুলে নিলেন এরপর তাদেরকে সামনে বসিয়ে বললেন- আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন- اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (আত্তাবাগুন: ১৬) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার কারণ। আমি এদের দুজনকে হাঁটতে দেখলাম, মাঝে মাঝে পড়ে যায় তাই দেখে আমি থাকতে পারলাম না, কথার মাঝেই তাদেরকে কোলে তুলে নিলাম।

(জামিয়ুত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৭৪)

হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)-এর সঙ্গে হাসান বিন আলি (রা.) -এর চায়তে অধিক সাদৃশ্য কেউ রাখত না।

(বুখারী, কিতাবু ফাযাইলু আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭৫২)

আবু বাকার (রা.) বলতেন, আমি নবী (সা.) কে মেম্বরে বলতে শুনেছি আর তাঁর পাশে হাসান (রা.) থাকতেন। তিনি (সা.) কখনও মানুষের দিকে দেখতেন আবার কখনও হাসানের দিকে। তিনি বললেন, আমার এই ছেলে সর্দার হবে।

আশা করি, আল্লাহ্ তা'লা এর কারণে মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দিবেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭৪৬)

একজন সাহাবী বলেন, রসুল করীম (সা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি সিজদায় অনেক দেরি করলেন। সিজদা দীর্ঘায়িত হতে দেখে আমার মনে আশঙ্কা দেখা দিল, পাছে কোনও দুর্ঘটনা হল না তো? আমি মাথা তুলে দেখি, হযরত রসুল করীম (সা.)-এর কাঁধে বসে আছেন যেভাবে কেউ ঘোড়ার উপর চড়ে বসে। এই দৃশ্য দেখে আমি দ্রুত সিজদায় চলে গেলাম। নামায শেষ হলে অন্যান্য সাহাবারা নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ! সিজদায় কি হুযুরের উপর কোনও ওহী নাযেল হয়েছে, যে কারণে আপনি এত বিলম্ব করেছেন না কি খোদা না করুক অন্য কোনও অসুবিধে ছিল। আমরা ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। রসুল করীম (সা.) বললেন, কোনও ওহীও হয় নি আর খোদার কৃপায় কোনও কষ্টও হয় নি। আমার এই ছেলেটা কাঁধের উপর চড়ে বসেছিল, আমি নিজেকে বললাম ক্ষণিকের জন্য সেও কিছুটা সওয়ারি করুক। যদি তাকে সরিয়ে দিই, তবে সে কষ্ট পাবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ:৬৩৩)

হযরত আবু বাকার সিদ্দীক এবং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে স্বল্প বয়সে তিনি তাদের স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছেন। হযরত উসমানও তাঁর যুগে তাঁর প্রতি এমন স্নেহসুলভ আচরণ করতেন। হযরত উসমানের যুগে তিনি পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছিলেন আর আর বিদ্রোহীরা যখন হযরত উমরের বাড়ি ঘেরাও করে, তখন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সেই বিপদ ও নৈরাজ্যের পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে বিদ্রোহীদেরকে ভিতরে ঢোকা থেকে আটকে রাখেন। এই বাধা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তিনি নিজেও আহত হন। তাঁর সারা শরীর রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়ে।

(সীয়ারুস সাহাবা, প্রণেতা-মাঈনুদ্দীন আহমদ নাদবী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪-১৫)

হযরত আলির মৃত্যুর পর ৪০ হিজরীতে হাসান বিন আলির নিকট খিলাফতের বয়আত হয় আর কয়েক মাস পর মুসলমানদের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার অবসান ঘটাতে তিনি খিলাফত থেকে সরে আসার ঘোষণা করেন আর মুয়াবিয়ার হাতে সঁপে দেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউ (আ.) বলেন- " আমার মতে, হযরত হাসান খিলাফত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। ইতিপূর্বেই বহু রক্তপাত হয়েছে। তিনি চান নি যে আরও রক্তপাত হোক। এই কারণে তিনি মুয়াবিয়ার কাছে সঁপে দেন। যেহেতু হযরত হাসান (রা.)-এর কাজটির জন্য শিয়ারা মর্মাহত হয়, তাই ইমাম হাসানের এই কাজের তারা পুরো সন্তুষ্ট নয়। আমরা দুজনেরই গুণগ্রাহী। বস্তুত উভয়ের পৃথক পৃথক ক্ষমতা ছিল বলে প্রতিভাত হয়। হযরত ইমাম হাসান চান নি মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরও বাড়ুক আর খুনোখুনি হোক। তিনি শান্তি প্রিয়তাকে দৃষ্টিপটে রেখেছেন আর হযরত ইমাম হোসেন দুরাচারির হাতে বয়আত করতে চান নি, কেননা এর ফলে ধর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। উভয়ের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ।

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৭৮-২৭৯)

ইবাদত

আল্লাহ্র ইবাদত করা তাঁর সব থেকে প্রিয় কাজ ছিল আর অধিকাংশ সময় তিনি এই কাজেই ব্যতীত করতেন।

আমীর মুয়াবিয়া এক ব্যক্তির কাছে তাঁর সংবাদ জানতে চান। সেই ব্যক্তি তাঁকে জানায়, ফজরের নামারে পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুসাল্লায় বসে থাকেন এরপর ঠেসা লাগিয়ে বসে পড়েন। সাক্ষাত প্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বেলা হলে চাশতের নামায পড়ার পর উম্মেহাতুল মোমেনীনদের কাছে সালাম করতে যান। এরপর বাড়ি হয়ে পুনরায় মসজিদে চলে আসেন।

মক্কায় থাকাকালীন তাঁর রীতি ছিল, আসরের নামায খানা কাবায় বা-জামাত পড়তেন এবং নামাযের পর তওয়াফে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আবু সাঈদ বলেন, হাসান এবং হোসেন ইমামের সঙ্গে কাবায় নামায পড়েছেন এরপর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে সাতবার তওয়াফ করেন অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায পড়েন। লোকেরা যখন জানতে পারল যে তারা উভয়ে নবী পরিবারের প্রদীপ, তখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেভাবে পতঙ্গদল প্রদীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর অত্যধিক ভিড়ের কারণে পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়। হযরত হোসেন এই ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়েন। হযরত হাসান একজন আরকানির সাহায্য নিয়ে তাঁকে ভিড় থেকে বের করেন। হযরত হাসান (রা.) একটি ফলকের উপর সূরা কাহাফ লিখিয়েছিলেন যা তিনি প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্বে তিলাওয়াত করতেন।

তিনি প্রত্যেক প্রকারের বাহন রেখে পেয়াদাসহ হজ্জ করতেন। ইমাম নওদী লেখেন, ইমাম হাসান একাধিক বার পায়ে হেঁটে হজ্জ করেছেন। তিনি বলতেন, খোদার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাওয়ার সময় যদি পাঁয়ে হেঁটে না যাই, তাহলে আমার দ্বিধাবোধ হয়।

(সীরাতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৮, প্রণেতা-মাঈনুদ্দীন)

অর্থ-সম্পদের কুরবানী।

হযরত ইমাম হাসান (রা.) তিন বার নিজের অর্ধেক সম্পদ খোদার পথে খরচ করেছেন আর অর্ধেক সম্পদ খরচের বিষয়ে এতটাই কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন যে, দুটি জুতোর মধ্যে একটি জুতোও দান করে দেন এবং দ্বিতীয় বার সম্পদের পুরোটাই খোদার পথে খরচ করে দেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা)

তাঁর দানশীলতা

একবার এক সিরিয়ার অধিবাসী মদিনায় আসে। সেই ব্যক্তি হযরত আলি (রা.) সম্পর্কে অশোভনীয় কথাবার্তা বলছিল। সে দীর্ঘ যাত্রায় বের হওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তার কাছে না ছিল পাথেয়, আর না ছিল কোনও বাহন। সে মদিনাবাসীদের মাঝে অনেকের কাছে গিয়ে নিজের অসামর্থ্য নিয়ে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন কোথাও সে সফলতা পায় না। তখন এক ব্যক্তি তাকে হযরত হাসান সম্পর্কে জানাল। সে হযরত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

হাসান (রা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের সমস্যার কথা তুলে ধরল। হযরত হাসান (রা.) তৎক্ষণাত তার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেন এবং পাথেয় হিসেবে কিছু অর্থকড়িও সঙ্গে দেন। লোকেরা আপত্তি তুলে বলল, আপনি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে এমন আচরণ কেন করলেন যে আপনার এবং আপনার পিতার প্রতি বিদ্বেষ রাখে? তিনি (রা.) বললেন, আমি নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করব না কেন?

(তারিখে মদিনা ও দামাস্ক, প্রণেতা- ইবনে আসাকির, খণ্ড-১৩, পৃ:২৪৭)

একবার তিনি মদিনার কোনও এক খেজুর বাগানের দিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের হাতে রুটি নিয়ে এক গ্রাস নিজে খাচ্ছে এবং একবার করে কুকুরকে খাওয়াচ্ছে। তিনি বললেন, কুকুরকে তাড়িয়ে দিচ্ছ না কেন? ক্রীতদাস উত্তর দিল, যদি ওকে তাড়িয়ে দিই, তাহলে ওর চোখে আমার চোখ পড়লে আমার লজ্জা করে। তিনি সেই ক্রীতদাসকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল সে আবান বিন উসমানের ক্রীতদাস। তিনি প্রশ্ন করলেন, বাগানটি কার? সে উত্তর দিল, আবানের। হযরত হাসান বললেন, আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি তুমি কোথাও যাবে না। কিছুক্ষণ পযর তিনি ফিরে এসে ক্রীতদাসটিকে বললেন, আমি তোমাকে কিনে নিয়েছি। সে প্রভুর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করল, হে আমার প্রভু! আল্লাহ্, রসুল এবং প্রভুর আনুগত্যের জন্য হাজির আছি। তিনি (রা.) বললেন, আমি বাগানটিও কিনে নিয়েছি। তুমি খোদার পথে মুক্ত আর এই বাগানটি আমি তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে উপহার দিলাম। হে আমার প্রভু! যে সত্তার জন্য আপনি আমাকে মুক্ত করেছেন, তাঁর পথেই আমি এই বাগানটি উপহার দিলাম।

(তারিখে মদিনা ও দামাস্ক, প্রণেতা- ইবনে আসাকির, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৪৬)

একবার এক ব্যক্তি হযরত হোসেনের কাছে নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনি সেই সময় এতেকাফে বসে ছিলেন। তিনি (রা.) বললেন, আমি যদি এতেকাফে না বসে থাকতাম, তাহলে তোমার সঙ্গে বের হয়ে তোমার চাহিদা পূরণ করতাম। সেখান থেকে জবাব পেয়ে সে হযরত হাসানের কাছে আসে। তিনিও এতেকাফে বসে ছিলেন। কিন্তু তিনি এতেকাফ থেকে বের হয়ে এসে সেই ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করেন। কিছু লোক হযরত হোসেনের কথার উল্লেখ করে (অর্থাৎ হযরত হোসেন সেই ব্যক্তিকে এতেকাফের অজুহাত দিয়েছিলেন) তিনি বললেন, খোদার পথে কোনও ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করা আমার মতে এক মাসের এতেকাফে বসার থেকে উত্তম।

একদিন তিনি তওয়াফ করছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজনে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। তিনি (রা.) তওয়াফ ছেড়ে তার সঙ্গে যান আর তার প্রয়োজন মিটিয়ে ফিরে এলে কোনও এক বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি আপত্তি করে বলেন, হে আবু মহম্মদ! তুমি তওয়াফ ছেড়ে অমুকের সঙ্গে চলে গেলে? হযরত হাসান (রা.) উত্তর দিলেন- তার সঙ্গে কেনই বা যেতাম না, যখন কিন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে যায় আর যদি তার প্রয়োজন মেটে, তাহলে গমণকারীর একটি হজ্জ এবং একটি উমরার প্রতিদান পায় আর যদি না পূরণ না হয় তবুও একটি উমারার প্রতিদান পায়। সুতরাং, আমি একটি হজ্জ ও একটি উমরার প্রতিদান পেয়েছি। এছাড়া ফিরে এসে তওয়াফও পূর্ণ করেছি।

(তারিখে মদিনা ও দামাস্ক, প্রণেতা- আসাকির, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৪৭)

ধৈর্য ও সহনশীলতা।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- এক ব্যক্তি সিরিয়া থেকে মদীনায় এসে বলে, ছিপছিপে শরীরের এক অশ্বারোহী আরবী ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করছিল। আমি জীবনে এমন সুদর্শন ব্যক্তি দেখি নি। তার অসাধারণ চলন আমার মনকে আকৃষ্ট করছিল, শুধু তাই নয়, তার ঘোড়ার পায়ের শব্দ আমার আত্মাকে পদদলিত করছিল। আমি লোকেদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই ব্যক্তি কে? তারা বলল, ইনি হলেন হাসান বিন আলি (রা.) । আমি দুজনের নাম শুনেই ক্রোধে জ্বলে উঠি। বিদ্বেষের আগুন আমার আপাদ-মস্তক পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আলির ছেলে এমন হয়েছে! আমি সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করি। পথে আমি তার ঘোড়ার লাগাম ধরে বলি, হে অশ্বারোহী! তুমি আলির ছেলে? হযরত হাসান উত্তর দিলেন- হ্যাঁ! আমি তখন হযরত আলি সম্পর্কে নানান কুকথা বলতে থাকি। কিন্তু, কুর্নিশ জানাই তার ধৈর্যকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি হযরত আলির নিন্দা করতে থাকি, তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকেন, শেষে আমি নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ি। আমার কথা শেষ হলে তিনি সহাস্যে বললেন, তুমি হয়তো মুসাফির আর সিরিয়া থেকে আসছ। আমি বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার সঙ্গে চল যাতে তোমার আপ্যায়ন করতে পারি আর কিছু অর্থকড়ি দিয়ে তোমার প্রয়োজন মেটাতে পারি। একথা শুনে আমি যারপরনায় লজ্জিত হই। আমি তাঁর সম্মানজনক আচরণ ও অভ্যাস দেখে ভীষণ আশ্চর্য হই। তাঁর এই কথাটি আমার মনকে এমন বিচলিত করে তোলে যে আমি আর থাকতে পারি নি, অবলীলায় তাঁর হাতে বয়আত করে ফেলি। এই ঘটনার পর থেকে আমি প্রতিটি জিনিসের থেকে তাঁকেই সব চেয়ে বেশি ভালবাসতে শুরু করি।

(সাআদাতুল কোনাইন ফি ফাযাইলি হোসেন, প্রণেতা-মুফতি মহম্মদ কেরামুদ্দীন, পৃ: ৮৪)

হযরত হাসান (রা.)-এর ক্ষমাশীলতা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"কথিত আছে যে ইমাম হাসান (রা.)-এর নিকট এক ভৃত্য চায়ের কাপ নিয়ে আসে। কাছে এলে অসতর্কতাবশত চায়ের কাপটি হযরত হাসানের মাথায় পড়ে যায়। তাঁর কষ্ট হওয়ায় তিনি ভৃত্যের প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন মাত্র। ভৃত্য নিচু স্বরে এই আয়াতটি পাঠ করল- وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ (আলে ইমরান: ১৩৫) হযরত হাসান শুনে বললেন, 'কাযামতু' (গিলে নিলাম)। ভৃত্য পুনরায় বলল, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (আলে ইমরান: ১৩৫) 'কাযাম'-এর অবস্থায় মানুষ ক্রোধকে দমন করে, প্রকাশ পেতে দেয় না। কিন্তু মনের মধ্যে পুরোপুরি সন্তুষ্টি থাকে না, এই কারণে ক্ষমার শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। তিনি (রা.) বললেন- আমি ক্ষমা করলাম। এরপর সে পড়ল- وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন তারাই যারা ক্রোধ দমন এবং ক্ষমাদানের পর পুণ্যকর্মও করে। তিনি (রা.) বললেন, যাও তোমাকে মুক্ত করলাম। পুণ্যবানদের নমুনা দেখুন! চায়ের কাপ উল্টে যাওয়ায় এক ক্রীতদাস মুক্তি পেয়ে গেল।এখন বল তো এই উৎকৃষ্ট নমুনা কি উন্নত মতাদর্শের পরিণাম নয়?"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৫)

হাসান ও হোসেনের জীবনীর আলোকে জামাতের অগ্রগতি।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কেও আল্লাহ্ তা'লা নিরবধি বলেছেন যে, জামাত আহমদীয়াকেও অনুরূপ কুরবানী করতে হবে যেমনটি পূর্ববর্তী নবীগণের জামাতদের করতে হয়েছে। একবার তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি নিযামুদ্দীনের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন। নিযামুদ্দীন-এর অর্থ ধর্মের ব্যবস্থাপনা আর স্বপ্নের অর্থ হল একদিন আহমদীয়া জামাত ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় পরিণত হবে আর পৃথিবীর অন্যান্য সকল ব্যবস্থাপনার উপর জয়ী হবে। কিন্তু এই বিজয় কিভাবে আসবে। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নের বিষয়ে তিনি বলেন, সেই ঘরে আমরা প্রবেশ করব কিছুটা হাসানের পদ্ধতি অবলম্বন করে আর কিছুটা হোসেনের পদ্ধতি অবলম্বন করে। (তাযকেরা, ২য় সংস্করণ, পৃ: ৭৮৮-৭৮৯) একথা সর্বজনবিদিত যে হযরত হাসান যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তা শান্তি ও চুক্তির মাধ্যমে করেছিলেন আর হযরত হোসেন সফলতা অর্জন করেছিলেন শাহাদাতের মাধ্যমে। তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে বলা হয়েছে যে, নিযামুদ্দীনের মর্যাদায় জামাত অবশ্যই পৌঁছবে, কিন্তু কিছুটা শান্তি, ভালবাসাও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আর কিছুটা শাহাদত ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে। যদি আমাদের মধ্যে কেউ মনে করে যে শান্তিচুক্তি, ভালবাসা ও সম্প্রীতি ছাড়াই এই জামাত উন্নতি করবে, তবে তারও ভুল হচ্ছে। আর কেউ যদি মনে করে যে আত্মত্যাগ ও শাহাদত ব্যতিরেকে জামাতের উন্নতি হবে তবে সেও ভুল করছে। আমাদেরকে কখনও শান্তি ও মীমাংসার দিকে যেতে হবে আবার কখনও হোসেনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে যার অর্থ হল শত্রুদের সামনে আমরা প্রাণত্যাগ করতেও প্রস্তুত হব কিন্তু তাদের বশ্যতা স্বীকার করব না। এই দুটি পন্থাই আমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কেবল ঈসাসুলভ আচরণও আমাদের জন্য নির্ধারিত নেই আবার মাহদীসুলভ আচরণও আমাদের জন্য নির্ধারিত নয়। আমাদেরকে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। একটি বিজয় আসবে শান্তি, ভালবাসা এবং সম্প্রীতির দ্বারা এবং অপর বিজয়টি আসবে কুরবানীর দ্বারা। এরপর জামাত নিযামুদ্দীনের ঘরে প্রবেশ করবে এবং সফলতা অর্জন করবে।"

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৩)

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.)-এর জীবনী।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ-কে ঐশীবাণীতে কামরুল আম্বিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ১৮৯৩ সালের ২০ শে এপ্রিল তাঁর জন্ম তারিখ আর ১৯৬৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মৃত্যু দিন। প্রায় ৭৫ বছর সময়কালে তিনি নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তাদের নুরের অনুসরণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে বিপন্ন মানবতার জন্য পূর্ণিমার স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছেন যা প্রমাণ করে যে সত্যিই তিনি নবীকুলের শশি।

কমরুল আম্বিয়ার অর্থ , সে নবীদের থেকে তাঁদের আলোক গ্রহণকারী হবে, তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুণাবলীর প্রচারকারী হবে এবং তাঁদের আলোকে জীবন যাপনকারী হবে। আর এমনটিই হয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের মাঝে তাকওয়ার একাধিক দিক স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান ছিল। বিনয় ও নম্রতা, প্রদর্শনকামিতা এড়িয়ে চলা, স্বার্থপরতা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করা, পানাহার, পরিধান ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে তাঁর চিত্তাকর্ষক সরলতা পরিলক্ষিত হত। পার্থিব জীবনকে কেবল পরকালের বাহন হিসেবে ব্যবহার করা , ধর্মের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা দুঃখ কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করা, ধৈর্য ও অবিচলতার উৎকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শন করা সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি, খোদা তা'লার স্মরণকে আধ্যাত্মিক আহার হিসেবে গ্রহণ করা এবং ঐশী প্রেমে বিভোর থাকা ইত্যাদি গুণগুলি আল্লাহ্‌র তাকওয়ার নিদর্শন ছিল যা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হত।

হযরত মিঞা সাহেবের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে এই সত্য উন্মোচিত হয় যে, তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তিবৃত্তিকে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত

করেছিলেন। তাঁর ধর্মের সেবার মধ্যে অনেক বিবিধতা ছিল। সাহিত্য কীর্তি হিসেবে আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার সম্মিলিত বহু পুস্তক ও পুস্তিকা তাঁর লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে। জামাতের তালিম ও তরবীয়তের জন্য পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধও তিনি নিয়মিত লিখতেন। যুবক শ্রেণীর এবং সমগ্র জামাতকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ধর্ম সেবায়, বিশেষ করে লেখনী কাজে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করতেন এবং নিজের মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করতেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিপরিসরে খোঁজ নিতেন এবং এমন স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শন করতেন তারা তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়ত। বস্তুত তিনি তাঁর যাবতীয় শক্তিসামর্থ এবং সময়কে ধর্ম, দেশ ও জাতির প্রত্যেক প্রকারের সেবা নিয়োজিত করে খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির কাজে ব্রতী হয়েছিলেন।

যেরূপে তিনি যুবসমাজের জন্য ধর্ম সেবা এবং আত্মোৎসর্গীকরণের এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা ছিলেন, শারিরিক কষ্ট ও রোগব্যধি সত্ত্বেও প্রচণ্ডভাবে জামাতের সেবায় নিমজ্জিত থাকতেন, তা বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তরবীয়তের বিষয়ে হযরত মিঞা সাহেব প্রায়শই শিষ্টচারের ভঙ্গি অবলম্বন করতেন। কামরুল আম্বিয়ার উপাধিতেও এবিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঐশী ভালবাসার এক অনন্য পন্থা (বিসমিল্লাহ লেখার বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা, প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করা।

নাযারত খিদমতে দরবেশান অফিসের এক কর্মী মাননীয় মুখতার আহমদ হাশমি সাহেব লেখেন- একবার আমি মিঞা হযরত মিঞা সাহেব (রা.)-এর বাড়িতে অফিসের চিঠি নিয়ে উপস্থিত হই। তিনি কাজের শেষে বললেন, আমার কলমের নিপ খারাপ হয়ে গেছে। আপনি বাজার থেকে আমার জন্য একটা ভাল কলম কিনে এনে দিন। আমি বাজার থেকে দুই-তিনটি নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসলাম। তিনি কাগযে একে একে প্রত্যেক কলম দিয়ে কিছু লিখলেন এবং শেষে একটি কলম তিনি পছন্দ করলেন। তিনি আমাকে সেই কলমের লেখাও দেখালেন। আমি কাগযে দেখলাম, তাতে কয়েকবার বিসমিল্লাহ লেখা ছিল। তিনি বললেন, আমি যখনই কোনও নতুন কলম কিনেছি, তাতে সব সময় প্রথমে বিসমিল্লাহই লিখেছি। কলমের নিপ ও কালি পরীক্ষা করার জন্য যদি কিছু লিখতেই হয় তবে অন্য কিছু না লিখে বা শুধু শুধু দাগ টেনে দেখার চায়তে আল্লাহ্‌র নাম দিয়ে শুরু করা শ্রেয় নয় কি? অনুরূপভাবে কাদিয়ানের কাফিলাদের বিষয়ে যে সব সরকারি চিঠি ইংরেজিতে পাঠানো হত সেগুলির বিষয়ে তিনি দপ্তরে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে চিঠির শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম ওয়া নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল করীম 'অবশ্যই লেখা হয়। আর যেখানে সম্বোধন করা হয় সেখানে যেন আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ লেখা হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা হতে থাকে।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা

একবার হযরত মিঞা সাহেব আমাকে একটি খসড়া লিখতে দেন। সেখানে একটি বাক্য ছিল- হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন। আমি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবর্তে 'صلعم' লিখে দিই। স্বাক্ষর করানোর সময় তিনি বললেন, صلعم লেখা অপছন্দনীয়। যেখানে এত দীর্ঘ বাক্য লেখা যেতে পারে, সেখানে কেবল রসুল করীম (সা.)-এর নামকেই এমন সংক্ষিপ্ত করার কথা মাথায় কেন আসে? এরপর তিনি নিজের কলম দিয়ে সাল্লেল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম' লিখে দেন। এরপর আমি আর কখনও صلعم লিখি নি। সেই সময় তিনি আরও বলেছিলেন, 'ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত রূপে Mohd লেখাও আমার ভীষণ অপছন্দ।Mohd লেখা দেখে আমার সব সময় আক্ষেপ ও দুঃখ হয় যে, জানি না কে এই অপ্রিয় পদ্ধতিটার উদ্ভাবন করেছিল, কেবল মহম্মদ নামের উপরই সংক্ষিপ্ত করণের সমস্ত জোর প্রয়োগ করেছে।

একবার হযরত মিঞা সাহেব পাকিস্তানের বাইরের মুবাল্লিগদের নামে দপ্তরের ছাপানো প্যাডের পরিবর্তে সাদা কাগজে চিঠি লেখান। আমি চিঠির হেডারে - এ লিখে দিই। সই করতে করতে তিনি বললেন, আপনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে 'সলাত' এবং সালাম দুটি শব্দই লিখেছেন, কিন্তু হযরত রসুল করীম -এর সঙ্গে কেবল 'সলাত' লিখেছেন। এটা ঠিক না। তিনি প্রভু আর ইনি হলে দাস। এখানে 'ওয়া আলা আব্দিহিল মসীহিল মাউদ' লেখাই যথেষ্ট। তবে যদি কোথাও পৃথক লিখতে হয় তবে 'আসসালাতো ওয়াস সালাম' লিখলে আপত্তির কিছু নেই।

হযরত আমীরুল মোমেনীন-এর প্রতি ভালবাসা

মুখতার হাশমি সাহেব বলেন: যখন তিনি তাঁর বাড়ি 'আল বুশরা' তৈরী করলেন এবং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোয়ার্টার ছেড়ে সেখানে যাওয়ার উপক্রম করলেন, তখন বললেন, 'আমার মন চাইছে এই বাড়িতেই থাকি। এখানে আমি হযরত সাহেবের কাছে থাকব, সেখানে গিয়ে দুরে হয়ে যাব। এটি ছোট্ট একটি বাক্য, কিন্তু এর থেকে অনুমান করা যায় যে হযরত মিঞা সাহেবের নিকট সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীনের থেকে এই সামান্য ব্যবধানও কতটা কষ্টের মনে হচ্ছিল।

জীবনের কয়েকটি ঘটনাবলী।

একথা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল যে কামরুল আম্বিয়া হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দরজা অসহায় এবং মিসকীনদের জন্য সর্বক্ষণ খোলা থাকত। দুঃস্থ ছাত্ররা বইপত্র এবং স্কুলের বেতনের টাকার জন্য নিজেদের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হত আর তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে যথাসাধ্য সহায়তা করতেন।

পাকিস্তানে কাদিয়ানের দরবেশদের পরিবার ও সন্তানসন্ততিদের জন্য তিনি পিতৃতুল্য ছিলেন। কোনও দরবেশের সন্তান যখন তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিজের সমস্যার কথা জানাত, তখন অসহয়াদের বিপদ দেখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হত আর তার সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করতেন। তার জন্য দোয়াও করতেন যার ফলে সেই দারিদ্রক্লীষ্ট সন্তানটি বুকে সাহস পেত।

হযরত কামরুল আম্বিয়া এবং ওয়াকফীনে যিন্দগীদের সম্পর্ক।

আফ্রিকার মুবাল্লিগ মৌলানা মহম্মদ মানোয়ার সাহেব লেখেন- ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে আমি যখন ছুটিতে পাকিস্তান যাই, তখন ঘটনাক্রমে রাবোয়ায় মসজিদ মুবারকে পাশেই হযরত মিঞা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায়। করমর্দন করার আমি নিবেদন করি যে, আমি পূর্ব আফ্রিকায় চার বছর থেকে মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। এখন ছুটিতে এসেছি। একথা শোনা মাত্রই হযরত সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরেন এবং কুশল সংবাদ জানতে চান। তাঁর সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার যে আনন্দ আমি সেই মুহূর্তে অনুভব করেছিলাম তা আমার কাছে অবর্ণনীয়। হযরত মিঞা সাহেব সম্ভবত আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না, তাছাড়া আমার পিতারও কোনও উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সেবা ছিল না যার কারণে তিনি আমাকে চিনতেন। আর মিঞা সাহেবেও সচরাচর এভাবে পথে ঘাটে লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আলিঙ্গান বন্ধ হতেন না। আর তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ভয়ের কারণে আলিঙ্গানবদ্ধ হওয়ার সাহস আমিও কখনও পাই নি। কিন্তু যখন শুনলেন আমি আফ্রিকায় কয়েক বছর ধর্ম প্রচারের কাজ করেছি, তিনি আমাকে উৎসাহ দিতে এমনভাবে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ করলেন যে সেই ভালবাসাই আমার জন্য জীবনের সম্পদ হয়ে উঠল। ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচেষ্টারত সমস্ত খুদ্দামকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন আর তাদের জন্য সবসময় দোয়া করতেন।

মৌলানা সাহেব আরও লেখেন, ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে আট বছর পর আমি পুনরায় রাবোয়া আসি। হযরত আকদস খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর হাত চুম্বনের পর হযরত মিঞা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যও উপস্থিত হই। তাঁর সেবক দেরুওয়ালের মহম্মদ শরীফ সাহেব ভিতরে সংবাদ দেন এবং এসে জানান যে হযরত সাহেবের শরীরটা ভাল না,তাই আজ সাক্ষাত করতে পারবেন না। আমি ফিরে আসি। দুই-চার পা ফেলতে না ফেলতেই অপর এক খাদিম ছুটে এসে বলল, হযরত সাহেব আপনাকে ডাকছেন। আমার আনন্দের সীমা ছিল না। ভিতরে গিয়ে দেখি হযরত মিঞা সাহেব খাটের উপর শায়িত আছেন, তাঁর বিবর্ণ চেহারায় ক্লান্তি ও উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। ইঞ্জিতে বিছানার উপর নিজের কাছেই আমাকে বসতে বললেন। এরপর বললেন, উম্মে যাফর আঘাত পাওয়ার কারণে বিনিদ্র রাত্রি কাটাতে হয়েছে। তাঁর অস্থিরতার কারণে আমিও ঘুমোতে পারি নি। এখন দুর্বলতা এবং উৎকণ্ঠা দুটোই আছে। এই কথাগুলি শুনে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। একথা ভেবে যে, আমি হযরত মিঞা সাহেবের জন্য কষ্টের কারণ হলাম। কিন্তু সেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি মোটেই জানতাম না। পরবর্তীতে 'আল ফযল পত্রিকা' থেকে জানতে পারি যে গোসলখানায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে গিয়েছে। কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব! আমার মনোকষ্ট হয় দেখে তিনি নিজের কষ্টকেও ভুলে গেলেন। অথচ সেই মুহূর্তে সাক্ষাত না হলেও তাঁর দরবারে দশ বার যেতেও আমার কোনও কষ্ট হত না। এরপর যখন আমি তাঁকে উপহার দিতে গেলাম, তখন তিনি একথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে আপনি ধর্মের সেবক, এটা নিজের কাছেই রাখুন।

উর্দু সাহিত্যের মহান গদ্যকার।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)=এর বাণী থেকে কল্যাণমণ্ডিত জামাত এমন সব লেখক ও প্রবন্ধকার জন্ম দিয়েছে যারা এক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থক সেবা সম্পাদন করেছেন। সেই সব শীর্ষস্থানীয় নামগুলির মধ্যে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও অন্যতম, যিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যের এক সুবিশাল ও অক্ষয় রচনাভাণ্ডার রেখে গেছেন। তাঁর লেখনীর এক অমর কীর্তি 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন,' এমনই এক ঐতিহাসিক সম্পদ । এছাড়া তাঁর আরও অনেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। হযরত মিঞা সাহেব সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা এক অনন্য রচনা শৈলী দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তার গদ্য রচনাগুলিকে এমন এক বাগানের সঙ্গে তুলনা করা চলে যার মধ্যে হরেক রঙের ফুল সুশোভিত আছে। অসাধারণ বাগ্মিতা, সাবলীল ও অবাধ বর্ণনা,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 7-14 July, 2022 Issue No. 27-28

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

শব্দ চয়ন, পছন্দের ধারাবিন্যাস, অলংকার ও উপমার পরিশিলীত প্রয়োগ তাঁর রচনার অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর তিরোধানের পর জামাতের উপর যেন বিপদের এক পাহাড় নেমে আসে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে জামাতের সদস্যদের ভাবাবেগের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তিনি বলেন–

"এই সংবাদটি জামাতকে যেন শোকে উন্মাদ প্রায় করে তুলেছে, তাদের চোখে জগতে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে আর প্রতিটি হৃদয় যেন শোকে ফেটে পড়ছে আর প্রতিটি চোখ তার প্রিয়তমের বিচ্ছেদ বেদনে অশ্রুসজল ছিল আর প্রতিটি হৃদয় বিরহ জ্বালায় পুড়ে ছাই হচ্ছিল।"

অনুভুতির জগতের সঙ্গে তিনটি বস্তুর সম্পর্ক রয়েছে– হৃদয়, চোখ এবং বক্ষ। তিনি (রা.) কি অসাধারণ পন্থায় সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে শিল্পিসুলভ দক্ষতায় এই তিনটির অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। অতঃপর তিনি বলেন–

"অনেকেই শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কেউ কেউ আবার একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, তাদের প্রিয় নেতা, তাদের প্রিয় প্রভু, তাদের চোখের আলো, হৃদয়ের প্রশান্তি , জীবনের সহায় ও তাদের উজ্জ্বল নক্ষত্র সত্যিই বিদায় নিয়েছেন।"

জামাতের সদস্যদের তাঁর প্রতি যে গভীর ভালবাসা ছিল এবং আছে, তার বহিঃপ্রকাশকে বোঝাতেই তিনি 'প্রিয় ইমাম, 'প্রিয় প্রভু', মনের প্রশান্তি, জীবনের সহায়, উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইত্যাদি শব্দযুগল ব্যবহার করেছেন। শব্দগুলির যথোপযুক্ত প্রয়োগ যেন তাঁর বর্ণনায় এক নৈসর্গিক মাত্রা যোগ করেছে।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন দৃশ্যের অন্যান্য দিকগুলি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন–

"বিরোধীদের কাছে যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছল, তারা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দ সংগীত গাইল আর হর্ষ উল্লাসে মেতে উঠল আর হর্ষধ্বনি দিতে শুরু করল। তারা নকল জানাযা তৈরী করে প্রদর্শনী মিছিল বের করল।"

তাঁর এই বর্ণনায় প্রকৃত দৃশ্যই যেন আমাদের মস্তিষ্কে ফুটে ওঠে আর এটাই একজন ভাল সাহিত্যিকের পরাকাষ্ঠা।

অতঃপর জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

'আমাদের বেদনার্ত চোখগুলি এই দৃশ্য দেখেছে আর আমার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় বুকের মধ্যে রক্ত রঞ্জিত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আমরা তাদের অত্যাচারের সামনে ধৈর্য প্রদর্শন করেছি। ..... আমি আমার ভবিষ্যত প্রজন্মকেও একথাই বলছি, সেই প্রজন্ম যাদের মাথায় সাম্রাজ্যের মুকুট রাখা হবে, খোদা তা'লা যখন তোমাদেরকে জাগতিক ক্ষমতা দান করবেন আর তোমরা শত্রুদের দমন করার সুযোগ পাও, আর তোমাদের হাতকে কোনও মানবীয় শক্তি প্রতিহত করার মত না থাকে,তখন তোমরা তোমাদের অতীতের শত্রুদের অত্যাচারকে স্মরণ করে উত্তেজিত হয়ে পড়ো না আর আমাদের দুর্বলতার যুগের সম্মান রক্ষা করো। যাতে লোকে একথা না বলতে পারে যে, এরা যখন দুর্বল ছিল তখন শত্রুর সামনে গুটিয়ে থেকেছে আর এখন ক্ষমতা পেতেই প্রতিশোধের জন্য হাত বাড়িয়েছে। বরং সেই সময়ও তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে আর নিজেদের প্রতিশোধকে খোদার হাতে ন্যস্ত করবে। হে উর্দ্ধলোক! তুমি সাক্ষী থেকো। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে খোদার সত্য মসীহ্‌র দয়া ও ক্ষমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি।

হযরত চৌধরী যাফরুল্লাহ খান সাহেব লেখেন– হযরত সাহেবযাদা সাহেবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবার বিষয়ে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করতে চাই। এমনিতেই হযরত সাহেবযাদার সমস্ত জীবনই মানবতা, ইসলাম এবং জামাতের সেবায় উৎসর্গিত ছিল। আর আল্লাহ্‌র কৃপায় বিভিন্নভাবে তিনি এই সেবা করার সুযোগ পেতেন আর সেই সুযোগকে তিনি পূর্ণত কাজে লাগিয়ে কায়োমনোবাক্যে ইসলাম তথা জামাত আহমদীয়ার দৃঢ়তার জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তাঁর দ্বারা সূচিত শিক্ষা–দীক্ষার ব্যবস্থা এবং নৈতিকতার শিক্ষার কল্যাণ চিরকাল অব্যাহত থাকবে আর বস্তুত, এটিই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। কিন্তু এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য সেবা ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হল হযরত আমীরুল মোমেনীন আল মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর অসুস্থতার প্রতিটি মুহূর্তে নিঃস্বার্থ ও নিরলস সেবা। এই সময়কালটুকু সমগ্র জামাত এবং পর্যায়ক্রমে সকল নিষ্ঠাবানদের জন্য এবং সর্বোপরি হযরত সাহেবযাদা সাহেবের জন্য ধৈর্য পরীক্ষার সময় ছিল। এই সময় যেভাবে তিনি নিজের দেহ, মন, আত্মা, যাবতীয় শক্তিবৃত্তি, উপায়–উপকরণ, নিজের সময়, আশা–আকাঙ্খা, সংকল্প, নিজের স্বাস্থ্য এবং জীবনকে খোদা তা'লার ইচ্ছের অধীন সঁপে দেন, সেটা তাঁরই অংশ ছিল, অন্য কারো দ্বারা এই কাজ সম্ভব হত না। হযরত আমীরুল মোমেনীন (আই.)–এর অসুস্থতা এবং কষ্টের অনুভুতি এবং এর যন্ত্রণা একদিকে আর অন্য দিকে সেই যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা। জামাতের বিষন্নতা ও উৎকণ্ঠার মাঝে প্রতিটি বেদনাকে অনুভব করা এবং প্রত্যেকের মনোতুষ্টি করা এবং উৎসাহ দান করা। অন্যদিকে ছিল জামাতের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং এর বিভিন্ন বিভাগের কর্মতৎপরতার বিষয়ে পরামর্শ এবং উপদেশদানের দায়িত্ব। অপরদিকে স্পর্শকাতর চিন্তাধারা এবং অনুভুতিগুলিকে রক্ষা করে চলা। অশ্রু বইয়ে চলছিল আর কলিজা রক্তারক্তি হয়ে পড়ছিল,কিন্তু আমরা কেবল সেই কথাই বলছিলাম যাতে আমাদের প্রভু সন্তুষ্ট হন। আমাদের পবিত্র পিতা (আ.)–এর নির্দেশ সর্বক্ষণ দৃষ্টিপটে ছিল।

মিঞা বশীর আহমদ সাহেব সেই নির্দেশকে নিজের কর্ম ও ভুমিকা দ্বারা সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তিলে তিলে নিজেকে বিসর্জন দিতে থেকেছেন, এমনকি

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ

আহ্বান শোনার পর

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

এর সঙ্গে শেষ বার তাঁরই দান তাঁকেই অর্পন করে নিজেকে যাবতীয় দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

****

২ পাতার শেষাংশ .....

দোয়া যে কেবল স্বমহিমায় পূর্ণ হয়েছে তাই নয়, বরং আঁ হযরত (সা.)কেও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, তাঁর শেখানো দরুদের দোয়া এইভাবে পূর্ণ হবে। এই দোয়ার পূর্ণতার সাধারণ বিকাশস্থল হল উম্মতে মহম্মাদীয়াকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত আওলিয়া আর উলেমাদের সুবিশাল উত্তরাধিকার দান করা হয়েছে। যেমনটি আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং বলেছেন–

عُلَمَاءُ اُمَّتِيْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ

অর্থাৎ "আমার উম্মতের আধ্যাত্মিক উলেমারা (প্রত্যেক শতাব্দীর মুজাদ্দিরাও যার অন্তর্ভুক্ত) নিজেদের পদমর্যাদা এবং আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষের নিরিখে বনী ইসরাঈলে নবীদের সমকক্ষ হবে।" অতএব, উম্মতে মহম্মাদীয়ার মধ্যে এই যে হাজার হাজার আওলিয়া এবং খোদার নৈকট্যভাজন উলেমা গত হয়েছেন যারা নিজেদের সময়ে জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি ঐশী বাণীও লাভ করতেন যাদের দ্বারা ইসলামের নভোমণ্ডল সুসজ্জিত ছিল, এরাই হলেন দরুদের বরকতময় দোয়ার নিদর্শন।

কিন্তু এই সাধারণ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ছাড়াও আঁ হযরত (সা.)–এর সঙ্গে একজন পূর্ণ প্রতিচ্ছায়ার প্রতিশ্রুতিও ছিল যার আবির্ভাবকে স্বয়ং আঁ হযরত (সা.)–এর আবির্ভাব হিসেবে ধরা হয়েছিল। যেমনটি সূরা জুমআর–'*ওয়া আখারীনা মিনহুম*' আয়াতে (অর্থাৎ শেষ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–কে এক 'বরুজ' (ছায়া) হিসেবে পুনার্বির্ভুত করবেন।) বলা হয়েছে আর আঁ হযরত (সা.) يُدْفَنُ مَعِيْ فِيْ قَبْرِيْ (অর্থাৎ আগমণকারী সংস্কারককে তাঁর মৃত্যুর পর নিজের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদার নিরিখে আমার সঙ্গেই রাখা হবে) – এর বাক্যে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিও হযরত মসীহ ও মাহদী (আ.)–এর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ যেভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ.)–এর দোয়ার পরিণামে আঁ হযরত (সা.)–এর আবির্ভাব ঘটেছে, অনুরূপভাবে كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ দোয়ার পূর্ণতার জন্য আঁ হযরত (সা.) পুনরায় পৃথিবীতে আবির্ভুত হয়েছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আর কোন কোন্ আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ হিদায়াতের আকাশে উদিত হয়ে দরুদের দোয়াকে পূর্ণ করবে তা কেউ জানে না।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ।

সারাংশ এই যে, দরুদে হযরত ইব্রাহিম (আ.)–এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার মাধ্যমে হযরত ইব্রাহিমের কোনও ব্যক্তিগত উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং হযরত ইব্রামি (আ.)–এর সেই দোয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল যার পরিণামে আঁ হযরত (সা.)–এর সত্তার আবির্ভাব ঘটেছে। আর এর উদ্দেশ্য হল, যেভাবে হযরত ইব্রাহিম (আ.)এর দোয়ার কল্যাণে আঁ হযরত (সা.)–এর ন্যায় বরকতমণ্ডিত সত্তা আবির্ভুত হয়েছেন, হে খোদা! অনুরূপে এখন আঁ হযরত (সা.)–এর উম্মতেও যেন তাঁর আধ্যাত্মিক প্রতিরূপের ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে আর এর মাধ্যমে এমন এক পবিত্র বলয় প্রতিষ্ঠিত হয় যা তোমার শেষ নূরের মাধ্যমে চিরকাল পৃথিবীকে আলোকিত রাখে। এই বিষয়টির সমাধান হওয়ার পর আমার আত্মা كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ বাক্যটি পাঠ করার সময় বাধাগ্রস্ত হওয়া কিম্বা হোঁচট খাওয়ার পরিবর্তে এক বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সুখানুভবের মধ্যে খোদা তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চলে আর সেই সব উজ্জ্বল নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য অবলোকন করে, যার দ্বারা আজ ইসলামের নভোমণ্ডল সুসজ্জিত রয়েছে, এমন এক আনন্দ অনুভব করে যা স্বাদ পূর্বে কখনও পাই নি।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir